সম্পূর্ণ উপন্যাস

পিশাচী

আশ্চর্য!

মার্চ-
এপরিল
১৯৬৬

গল্প
প্রতিযোগিতা !

Bengali Download

eBook Releaser Group Presents

Next Generation eBooks with No Watermark

We always encourage to buy original books

খোকনের জন্য

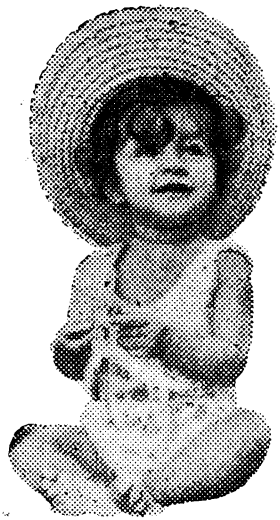

শিশুর কোমল ত্বক, ঘামাচি, চুলকনা প্রভৃতি চর্ম রোগের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য 'পার্ল পাউডার' অদ্বিতীয়। ইহার স্নিগ্ধ সুগন্ধ, সূক্ষ্ম রেণু খোকনের গা কোমল ও মসৃণ রাখবে এবং তা'র মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে তুলবে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের

পার্ল পাউডার

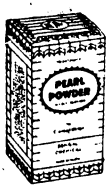

পরাগকোমল
প্রসাধন রেণু
শিশুদের কোমল
ত্বকের জন্য

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

আশ্চর্য !

বিশেষ বৈশাখী সংখ্যা : মে ১৯৬৬

ঐ সংখ্যায় থাকছে :

দি অ্যামফিবিয়ান (ধারাবাহিক উপন্যাস)
রচনা : আলেকজাণ্ডার বিলায়েভ
অনুবাদ : অদ্রীশ বর্ধন

মরণের ডঙ্কা (বড় গল্প) : রণেন ঘোষ

আকাশ শহরে ফিরলাম (গল্প) :
রবীন বিশ্বাস

অভিশপ্ত সন্তান (সিনেমার সচিত্র গল্প)

প্রথম শতাব্দীর মানুষ (সিনেমার গল্প)

পাখী-দৈত্যের কুহক-ঘণ্টা (ধারাবাহিক গল্প) : অদ্রীশ বর্ধন

আশ্চর্য পত্রমৈত্রী ক্লাব

এস এফ সিনে ক্লাবের খবর

কে কি কেন কবে কোথায়

অবিশ্বাস্য কিন্তু... ! : অজিতকুমার বর্ধন

নির্জলা বিজ্ঞান : অজিতকুমার বর্ধন

দাম ৭৫ পয়সা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৯৲
ষান্মাসিক ,, ,, ৫৲

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
৯৭-১, সারপেনটাইন লেন,
কলিকাতা ১৪

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

অত্যাশ্চর্য্য গুণাবলী

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী
সত্যই আশ্চর্য্যজনক।

ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী
তাহা নহে, মস্তিস্কের পক্ষেও পরম হিতকর।

সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮

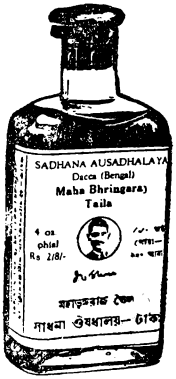

কলিকাতাকেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

SA 5/60

আনন্দের
দিনে

অতিথিদের

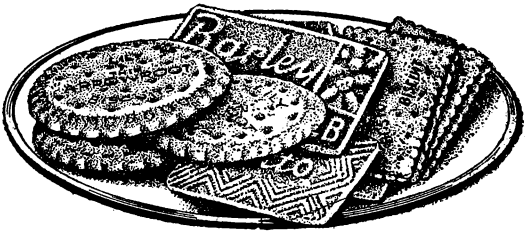

লিলি
বিস্কুট

দিয়ে আপ্যায়িত করুন.

লিলি বিস্কুট কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৩

যুগলমূর্ত্তি
ত্রিগুণ তৈল

এজেন্ট - বটকৃষ্ট পাল

শতাব্দীর
ঐতিহ্যমণ্ডিত
সর্বশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদোক্ত
কেশ তৈল

জাল নিবারণী সীলের উপর
এই ফটো দেখিয়া লইবেন

জুয়েল অফ ইণ্ডিয়া পারফিউম কোঃ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৩৪

বিস্ময়কর বিজ্ঞানভিত্তিক ও

আশ্চর্য!

ফ্যানটাসি গল্পকল্পের মাসিক পত্রিকা

'আশ্চর্য !'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শ্রীসত্যজিৎ রায়কে লেখা ওয়াল্‌ট ডিসনীর চিঠির অনুবাদ

জানুয়ারী ৩, ১৯৬৬

প্রিয় সত্যজিৎ রায়—

অধুনা প্রতিষ্ঠিত এস এফ সিনে ক্লাবের সভাপতিত্ব গ্রহণ করার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাই এবং আপনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আমার মনে হয়, তরুণ সম্প্রদায়ের জীবনে সংস্কৃতি বহন করে আনার জন্যে এবং তাদের জ্ঞানলোকের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমরা যা কিছুই করি না কেন, তা সবদিক দিয়ে উৎসাহ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। কিপলিং-য়ের "জঙ্গলবুক" অবলম্বনে একটা নতুন কার্টুন ছবি তৈরীর কাজ আমরা শীগগিরই সুরু করব। আমি জানি, এখবর আপনার মনে আগ্রহের সঞ্চার করবে।

১৯৬৭ সালের শেষের দিকে ছবিটা মুক্তি পাবে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমাদের তৈরী সেরা কার্টুন ছবির অন্যতম হবে এটি।

১৯৬৬ সালে আপনার এবং আপনার সহযোগীদের সুখ ও স্বাস্থ্য এবং এস এফ সিনে ক্লাবের কুশল কামনা করি।

বিশ্বস্ত—ওয়াল্ট ডিসনী

[এস. এফ. সিনে ক্লাবের উদ্বোধনী স্মরণী-পুস্তিকা থেকে অনূদিত]

আগামী সংখ্যায়

শ্রীসত্যজিৎ রায়কে লেখা বিশ্ববিখ্যাত আমেরিকান সায়ান্‌স্‌-ফিকশ্যন কাহিনীকার রে ব্রাডবুরীর চিঠির অনুবাদ

'আশ্চর্য !' পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতিমাসে

অ্যালফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌, পোষ্টবক্স ২৫৩৯, কলকাতা-১ কর্তৃক

চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

মার্চ-এপরিল, ১৯৬৬

সম্পাদক ঃ আকাশ সেন

শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরবর্তী ফিল্‌ম্ কি সায়ান্‌স্-ফিকশ্যন ?

সারা বাংলাব্যাপী তুমুল আন্দোলনের পর প্রকাশ পেল এই সংখ্যা। হরতালের দিন থেকেই বেশ কিছুদিন কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে। তাই অন্যান্য-দিকে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও এবারেও যথাসময়ে 'আশ্চর্য!' প্রকাশ করা গেল না। মার্চ-এপরিল একসঙ্গে প্রকাশিত হওয়ায় গ্রাহকদের চাঁদার মেয়াদ এক মাস বৃদ্ধি করা হলো।

দেরীতে প্রকাশ পেলেও এ সংখ্যায় গল্পগুলি উপভোগ্য। এ ছাড়াও রইল বিভিন্ন বিভাগের রকমারি স্বাদ। সেইসাথে, এস এফ সিনে ক্লাবের আগামী ছবির খবর এবং অন্যান্য চিত্তাকর্ষক টুকরো সংবাদ।

এই সংখ্যায় এমন একটি খবর আমরা প্রকাশ করলাম, যা ভারতের অন্য কোনো সংবাদপত্রে এখনো বেরোয়নি। কোন সাংবাদিকও এখনো সে খবর জানেন না। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সভাপতিত্বে এবং 'আশ্চর্য!'র উদ্যোগে এস এফ সিনে ক্লাব প্রতিষ্ঠার দুমাস যেতে না যেতেই "ফ্যানটাসায়ান্‌স্" থেকে আমন্ত্রণ এসেছে শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের কাছে। 'ফ্যানটাসায়ান্‌স্' একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের নাম—কেবলমাত্র সায়ান্‌স্-ফিকশ্যন ও ফ্যানটাসি ছবি নিয়েই প্রতিযোগিতা হবে এই উৎসবে। ভারতে প্রথম এই আমন্ত্রণ এলো 'আশ্চর্য!'র প্রধান পৃষ্ঠপোষকের কাছে। এ খবরে 'আশ্চর্য!'র পাঠকপাঠিকারা গৌরব-বোধ তো করবেনই, উপরন্তু চাঞ্চল্যকর এই সংবাদ সর্বপ্রথম 'আশ্চর্য!র' পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হওয়ার কৃতিত্বে নিশ্চয় গর্ব অনুভব করবেন।

সত্যজিৎ রায়ের বর্তমান ছবি 'নায়ক' মুক্তির প্রতীক্ষায়। শোনা যাচ্ছে, ওঁর পরবর্তী ছবি নাকি সায়ান্‌স্-ফিকশ্যন। সে ছবির গল্পও নাকি উনি লিখবেন এবং কাজ শুরু হবে আগামী জুন মাসে।

এ সংখ্যায় থাকছে

সাইরেন্‌স্‌ ওয়ার্লড (গল্প) জয়ন্তী সেন ৯
দূর থেকে মনে হয়েছিল পাথরের পিণ্ড, এখন সাপ কিলবিল করছে
পিশাচী (সম্পূর্ণ উপন্যাস) দেবব্রত চ্যাটার্জী ২৪
তিন-তিনটে খুনের দায়িত্ব তাঁর···থিসিস লিখে পি. এচডি. পেয়ে গেলেন
ডাঃ চট্টোরাজের চটক (গল্প) সৌরেশ দে ৫৫
চাঁদ নিয়ে কত হৈ চৈ···কিন্তু রোজ পূর্ণিমা কেউ করতে পারেন? পারেন চট্টোরাজ
সহজ পঠন পদ্ধতি (গল্প) সুরজিৎ চৌধুরী ৮৯
ঘুমিয়ে পরীক্ষা পাশ! নাড়ুদার কাহিনী পড়ে একটা মেসিন বানাতে ইচ্ছে হবেই!
আমি মানুষ নই (গল্প) শ্রীহর্ষ মল্লিক ১০১
পৃথিবী তার ঘর নয়, তবু সে ভালবেসেছিল···কিন্তু কি যে হয়ে গেল···
চাঁদ এবং গণিত (গল্প) সুব্রত চক্রবর্তী ১২১
স্রেফ অংক কষে বাহুবলীন্দ্র প্রমাণ করলেন খবরটা ডাহা স্বপ্ন!
পাখী-দৈত্যের কুহক-ঘণ্টা (ধারাবাহিক গল্প) অদ্রীশ বর্ধন ১২৯
বিক্রমজিৎ ফিরে এল···ঘণ্টার শব্দ শুনে সে নতুন ফাঁদে পড়ল!
পৌষ-চৈত্রের পরাজয় (গল্প) দুলাল পাল ৬৫
পাখা বা এয়ারকনডিশনের দরকার নেই···চাই আয়নার মত একটা কিছু
চাঁদের মেয়ে (ধারাবাহিক উপন্যাস) বিশু দাস ৭৮
পাখা দুটো লাগিয়ে আকাশে ভেসে পড়লো ওরা দুজনে
দি এ্যামফিবিয়ান ম্যান ১৪২
সায়ান্‌স্‌ ফিকশন সিনে ক্লাবের আগামী ছবির গল্প
এস. এফ. সিনে ক্লাবের খবর ১৩৮
'আশ্চর্য!' আর পাঠকমহল (চিঠিপত্র) ৮

মলাটের ছবিটি অবলম্বনে গল্প লিখতে পারেন?

৫০০০ শব্দের মধ্যে মলাটের ছবিটি নিয়ে একটি গল্প লিখে ১৫ই জুনের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সেরা গল্পগুলি প্রকাশিত হবে, পুরস্কৃত করা হবে।

আমাদের পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর মধ্যে প্রধান উপদেষ্টারূপে পদ্মশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শিল্প উপদেষ্টারূপে চন্দ্রনাথ দে আছেন।
এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিল্পী : শ্যামল সেন, অনিরুদ্ধ।

'আশ্চর্য !' আর পাঠকমহল

শ্রীহর্ষ মল্লিক, ঠাকুরপুকুর

গতকাল রেডিওতে 'অত্যাশ্চর্য' সবুজ মানুষের গল্প শুনলাম। বেশ ভালই লাগল। ওটা আগামী কোনো বিশেষ সংখ্যায় বার করুন না ?

দুলাল গুপ্তশর্মা, বাঘা যতীন পল্লী

রেডিওটা খুলেছিলাম, খবর হ'ল। প্রোগ্রাম দেখিনি। আলোচনায় যোগ দিলেন 'আশ্চর্য !'-র জনপ্রিয় লেখকরা। কিন্তু একি ? 'সবুজ মানুষে'র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার সংবাদে অনেকে (শ্রোতা) হতভম্ব।—দেখলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা রটে গেছে। অনেকে এলেন কিন্তু বেতার ততক্ষণে নীরব। তবুও জিজ্ঞাসাবাদে খবরা-খবর নেওয়া হতে লাগল। আমি তাদের বললাম—এটা বেতার সংবাদ নয়, বেতার সাহিত্যবাসর—রূপক। তবুও অনেকের সন্দেহ যায়নি। —রূপক হলে এরকম হবে কেন ? এযে প্রেমেনবাবু, সত্যজিৎবাবু, অদ্রীশবাবু বা দিলীপবাবুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কাহিনী। —সন্দেহ ভাঙালুম 'আশ্চর্য !' দিয়ে। —অনেকের মনে বিশ্বাস, রূপক হলেও এরকম ঘটতে কতক্ষণ ?—

শ্রীমতী দীপ্তি সিংহ, কলকাতা

রাইডার হ্যাগার্ডের "শী" আর অজয় হোমের "মরণ ঘুম"-এর প্রতিপাদ্য বিষয় এক নয়।

বিনয়ভূষণ গুহঠাকুরতা, পাটনা

হ্যাগার্ডের "শী" আর 'মরণ ঘুমে'র উর্বশী কি এক হল ?

অশোক ভট্টাচার্য, জামসেদপুর

অদ্রীশ বর্ধন লিখিত 'জোঁক' ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় লিখিত "ধোঁয়া" অত্যন্ত ভাল লাগল।

পরমভট্টারক লাহিড়ী, কলকাতা

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায় ও অদ্রীশ বর্ধনের লেখা আমি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়ি।

৫মে বার্ষিকী

★

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌

৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

ফোন : ৩৪-৭২৭৪

মনোরম
গ্রন্থ ও পত্রিকার
প্রকাশক

★

বাংলা বইয়ের তালিকা

●

১৯৬৬

* উপন্যাস
* ছোটগল্প
* কবিতা
* প্রবন্ধ
* ছড়া
* শিশুসাহিত্য
* ধর্মকথা
* রম্যরচনা
* রহস্য রচনা
* মনোবিজ্ঞান
* কবিতা
* এ্যাডভেঞ্চার
* প্রাচীন সাহিত্য
* নাটক
* জীবনী
* প্রহসন

কমিশনের হার :

পুস্তক বিক্রেতা : ১-১১ কপি——৩৫%
১২ কপি——৪০%

লাইব্রেরী : ২০% থেকে ৩০% সংখ্যানুপাতে

[বই পাঠানোর খরচ স্বতন্ত্র]

অদ্রীশ বর্ধনের

চারখানি চমকপ্রদ বই

মিলক গ্রহে মানুষ

চমকপ্রদ কল্পনা, শ্বাসরোধী রহস্য আর চাঞ্চল্যকর তথ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে রকেটগতি সম্পন্ন উপন্যাস। 'অতি সুন্দর'—আনন্দবাজার পত্রিকা। 'রহস্যময়'—দেশ। 'না পড়ে থাকতে পারবেন না'—রোমাঞ্চ। 'অভিনন্দন-যোগ্য'—পরিচয়। ২য় সংস্করণ, টা ৩্

পৃথিবী থেকে চাঁদে

জুল ভর্ণ-এর 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' সম্পূর্ণ উপন্যাসটির প্রাঞ্জল অনুবাদ—যে কাহিনী সারা পৃথিবীতে আলোড়ন এনেছিল। 'নিঃসন্দেহে উল্লেখ্য'—মাসিক বসুমতী। ২য় সংস্করণ টা ১'৭৫

শার্লক হোম্‌স্ ফিরে এলেন

৫২০ পৃষ্ঠায় ৬৪খানি ছবিতে সাজানো কোনান ডয়াল রচিত বিখ্যাত শার্লক হোম্‌সের তেরোটি ছোট উপন্যাসের মত ডিটেকটিভ গল্প সঙ্কলন। 'শার্লক হোম্‌সের গল্পসঙ্কলন বাংলায় এই প্রথম। প্রশংসনীয়'—আনন্দবাজার। ২য় মুদ্রণ টা ১০্

রোবার হলেন আকাশরাজা

মহাশূন্যের মধ্যে থেকে ভেসে আসছে এক বিস্ময়কর যন্ত্র-সঙ্গীত···কোথা থেকে আসছে এই শব্দ? আজ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর লোক এভাবে আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। বিজ্ঞানী রোবারের বিস্ময়কর রকেট উপন্যাস! টা ১'৭৫

মনোরঞ্জন দে'র

তিনখানি রুদ্ধশ্বাসী উপন্যাস

গ্রহে গ্রহে যুদ্ধ

ওয়েল্‌সের বিশ্ববিখ্যাত 'ওয়ার অব দি ওয়ার্লড্‌স' অবলম্বনে রচিত। শেষ পরিণতি না জানা পর্যন্ত ঘুম আসবে না। রকেট সিরিজের ২৫০ পৃষ্ঠার পকেট বই। 'বিশেষ আকর্ষণীয়'—বসুমতী। ৮০ পয়সা

ভূগর্ভে টার্জন

কেবলমাত্র একটি ছুরি আর চমকপ্রদ বুদ্ধির দীপ্তি নিয়ে টার্জন মাটির নীচে এক বিভীষিকা-ময় অমানুষিক অভিযানে নেমেছে। পড়তে পড়তে গভীর উত্তেজনায় আপনি অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন। 'পদে পদে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার কাহিনী'—আনন্দবাজার পত্রিকা। 'উপভোগ্য, আকর্ষণীয়'—বসুমতী। রকেট বই। টা ৩্

অন্ধ যে-দেশে সকলেই

ওয়েল্‌সের 'কান্ট্রি অব দি ব্লাইণ্ড' অবলম্বনে রচিত। প্রতিটি মানুষ যদি অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কেমন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, তার সুনিপুণ কাহিনী। মিষ্টিমৃদু রোম্যান্সে মেশানো রকেট উপন্যাস। টা ১'৭৫

চোর কুঠুরির আলো

'গোরা'। বিচিত্র পরিবেশে শান্ত রহস্যময় এক যুবকের কাহিনী। তার জীবনে পরম শুভ দিনটি শুধু বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। অপূর্ব স্বাদের চমৎকার উপন্যাস। 'অবসর বিনোদন করতে এ উপন্যাস ভালোই লাগবে'—বসুমতী। টা ৫'৭৫

আদিত্য কুমার ভট্টাচার্য্যের

দু'খানি উপভোগ্য বই

ঢেউভাঙ্গা মুক্তা

দ্রুতগামী ঘটনা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে সুবৃহৎ উপন্যাস। অ্যাল্‌ফা-বিটা গ্রন্থ প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত। 'রূপালী পর্দায় জীবন্ত ছবি'—যুগান্তর। 'শেষ পর্যন্ত কৌতূহল—আনন্দবাজার। টা ৬·৭৫

রোমাঞ্চকর নতুন পৃথিবী

বিজ্ঞানীর চমকপ্রদ উদ্ভাবন খাদ্য ট্যাবলেট, জলবোমা, ঘুম-কলম, ফটো-ফসিল ক্যামেরা প্রভৃতি নিয়ে উপভোগ্য রকেট উপন্যাস। 'সব বয়সের পাঠকরাই মজা পাবেন'—বসুমতী। টা ১·৭৫

সুখেন্দু সরকারের

দুখানি মনোরম বই

মাটি ও পৃথিবী

যৌবন স্বপ্ন দ্বন্দ্বদ্বিধার স্বচ্ছ মর্মস্পর্শী গল্প রূপায়ণ। মনে আনে ঝরণার স্নিগ্ধতা, প্রশান্ত সজীবতা। অবসর ভরিয়ে রাখার তৃপ্তি রয়েছে পাতায় পাতায়। 'নতুন পটভূমিতে রচিত'—আনন্দবাজার। টা ২·৭৫

দুটি গোলাপ একটি কুঁড়ি

সহজ ভঙ্গিমায় চিত্তস্পর্শী পারিবারিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা এক তরুণ দম্পতির অসহ্য টানাপোড়েনের কাহিনী। 'দুই নারীর চরিত্র সংঘাত···মাতৃত্বের তৃষ্ণা মেটায়'—বসুমতী। টা ৫·২৫

'নবফুল' রচিত

দু'খানি সুন্দর বই

কালো মাটি রাঙা মন

এতটুকু অলস আলোচনা নেই, তীব্রগতিতে বহে চলেছে মেহনতী মানুষদের মনোহর ঘটনা-প্রবাহ এই রঙিন উপন্যাসটিতে। 'শুধু কল্পনার রঙিন জালবোনা নয়, বাস্তব রূঢ়তার ইতিহাস-সম্মত আলেখ্য'—অধ্যাপক অমূল্য সেন, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। 'প্রতিশ্রুতিবান'—চতুষ্কোণ। 'অনবদ্য কাহিনী'—গণদূত। টা ৫·৭৫

কিংবদন্তির প্রেমকথা

বৌদ্ধযুগের হৃদয় দোলানো প্রেমকাহিনীর একটি অনবদ্য গুচ্ছ। সযত্নে চয়ন করা সুন্দর ছবির মতো কাহিনী। টা ২·৫০

জীবনের লুপ্ত রেখাগুলি

নারায়ণ চক্রবর্তী। অ্যাল্‌ফা-বিটা প্রতি-যোগিতায় বিশেষ পুরস্কারজয়ী, 'প্রবাসী' গল্প প্রতিযোগিতার বিজয়ী লেখকের আশ্চর্য সুন্দর গল্প গ্রন্থ। 'পাঠকের ভাল লাগবে'—আনন্দবাজার। 'লেখক নিঃসন্দেহে শক্তিশালী'—যুগান্তর। টা ৪·৫০

পিয়াসা

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। ষড়যন্ত্রের উত্তেজনা আর নিষ্ঠুরতার মনোবেদনা, হতাশার মাঝে বিরল কৌতুক আর দুঃখের অন্ধকারে স্বর্গীয় প্রেরণার অপূর্ব সংমিশ্রণে রচিত বৃহৎ চমৎকার উপন্যাস। 'প্রাণবন্ত'—যুগান্তর। টা ৮৲

অভিসার

অসিত চৌধুরী। জীবনের কতকগুলি চরম মুহূর্তের উপর রচিত এই গল্পগ্রন্থ এক অনাস্বাদিত জগতের স্বাদ বহন করে এনেছে। 'মানবজীবনের ছোট ছোট মুহূর্তকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন'—যুগান্তর। টা ৩·৭৫

নতশির উর্মি

গ্রেগরী মুখার্জী। অ্যাল্‌ফা-বিটা প্রতিযোগিতায় বিশেষ পুরস্কৃত ছায়াছবির মতো জীবন্ত উপন্যাস। বিশ্বাস করতেই হবে, বাসবীর সাহস ছিল। 'পড়তে পড়তে মনে হয় চলচ্চিত্র'—আনন্দবাজার। টা ৫৲

মানুষ-জন্তুর দ্বীপে

প্রদীপ মিত্র। সে এক ভয়ঙ্কর দ্বীপ···হৃদ্‌যন্ত্র দুর্বল থাকলে রক্ত-জমানো এই কাহিনী না পড়াই ভাল! 'অদ্ভুত সব কাণ্ডকারখানা'—আনন্দবাজার। 'এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মতো। উত্তেজনা, সাসপেন্স'—যুগান্তর। রকেট বই। টা ১·৭৫

মঙ্গলের ভয়ানক রক্তমণি

শ্রীধর সেনাপতি। লাল গ্যাসের গোলা শূন্য পথে তাড়া করে রকেটের দুর্ভেদ্য আবরণও ফুটো করে ফেলে···ওরা কী? 'কৌতূহলের অন্ত নেই'—আনন্দবাজার পত্রিকা। 'পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে ছাড়া সম্ভব হবে না'—বসুমতী। রকেট বই। টা ১·৭৫

হৃদয়ের স্বাক্ষর

জগদীশপ্রসাদ দাশ। ভারতের সঙ্কট কালকে পৃষ্ঠপটে রেখে লেখক অভিনব চিত্তাকর্ষক প্রেমের কাহিনী লিখেছেন। 'শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়।' —লীলা মজুমদার। 'সুন্দর'—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। টা ৪৲

ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী

শ্যামসুন্দর আগরওয়ালা 'শরদ' এবং **নির্মলেন্দু গৌতম** (রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত)। দুজন শক্তিশালী তরুণ গল্পকারের কলম মিলেছে এই মনোরম গল্পপ্রবাহে। কৌতুক আছে, নানা সুরের অন্তর ছোঁয়া কথাও আছে। টা ২·৫০

ঝড়ো ফুল

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। সমাজের প্রত্যেক মানুষের মনের কথা এরূপ উজ্জ্বলভাবে জীবন্ত ভাষায় অধুনা অতি অল্প উপন্যাসেই বিধৃত হয়েছে। 'সংস্কৃতিপূর্ণ'—অমৃত। 'সার্থক উপন্যাস',—বসুমতী। টা ৫৲

নেবু রায়

পল্লব রায়। বৈচিত্র্যে অনন্য, ভাববৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল গল্পগ্রন্থ। 'উজ্জ্বল, সুপাঠ্য'—আনন্দবাজার। 'ভারি উপভোগ্য, সুখপাঠ্য'—বসুমতী। টা ৩·৫০

পৃথিবীতে শিশুযুগ আসছে

গৌরীশংকর দে। সারা পৃথিবী জুড়ে শিশু-দৈত্যের রাজত্ব কাহিনী। অভিনব কৌতূহলোদ্দীপক। 'আশ্চর্য···এরকম দিন বইএর পাতা ছেড়ে বেরিয়ে এসে যদি সামনে দাঁড়ায়, তাহলে মন্দ হয় না বোধ হয়'—আনন্দবাজার। 'ভারী মজাদার'—বসুমতী। রকেট বই। টা ১·৭৫

জগদীশচন্দ্র দাশের

দু'খানি অনুপম কাব্যগ্রন্থ

নীল শহরের গলি

সরলতাও যে একটি বিশিষ্ট আর্ট, এই কবিতা-গুলি তা আর একবার প্রমাণ করল। চিন্তার ব্যাপ্তি, প্রতীকের সজীবতা, অলঙ্কারের মাধুর্য কবিতাগুলিতে মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। 'হৃদয়-প্রাণের গৌরবময় ভূমিকা' —আনন্দবাজার। 'সাধনার লক্ষ্য'—যুগান্তর। 'শহর-যন্ত্রণাটি বিশেষ ভাবে ধরা দিচ্ছে'—ধ্রুপদী। টা ২·৫০

কখন কুয়াশা

প্রাণের সবুজে ভরপুর, সুরস্নাত, সংক্ষিপ্ত প্রতিটি কবিতাখণ্ডে সহজ পরিস্রুত কাব্য-প্রতীকগুলি সযত্ন মগ্ন চেতনায় ঐন্দ্রজালিক নিপুণতার সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। 'পেলব সংবেদনশীলতা, পদ্ধতি হুইটম্যান বা লরেনসের মতো'—বিষ্ণু দে। 'বর্ণনাভঙ্গী বেশ কবিত্ব-ময়; সুদৃশ্য বই'—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। 'বক্তব্য প্রখর'—সাপ্তাহিক বসুমতী। 'মধুর রসে সিক্ত'—ধ্রুপদী। টা ৩৲

গল্প-উপন্যাস

মরণ ঘুম

অজয় হোম। স্বপ্নের মতো মধুর, অথচ গভীর ষড়যন্ত্রের মতো রুদ্ধশ্বাসী একেবারে নতুন স্বাদের একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস···চমকপ্রদ বর্ণনা ···ঝড়ের মতো গতি···সিনেমার মতো ঘটনা বিন্যাস···সব মিলিয়ে 'মরণ ঘুম' এক অভূত-পূর্ব রকেট উপন্যাস। টা ২·৭৫

মতি মুখোপাধ্যায়ের

দু'খানি তৃপ্তিকর বই

সন্ধ্যার জানালা

আবেগময় ভাষায় উপলব্ধির ছন্দ অনুরণিত হয়ে উঠেছে কবির কাব্যোচ্ছ্বাসে। 'উল্লেখ-যোগ্য···আশা-নিরাশার অন্তর্দ্বন্দ্ব·····কবির নিজস্ব ভূমিকা গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে' —ধ্রুপদী। টা ৩·২৫

চারশো পঞ্চান্ন দিন পরে

নন্দিতা দেবীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না— গল্পের সুরু।···তারপর পুলিশ, কলের মানুষ 'রবীন', ডকটর সামন্তের রহস্যময় ল্যাবরেটরী, মৌমাছি, হাসপাতাল·····অবশেষে বিস্ময়কর প্রাণ-বিনিময়ের চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে এই রকেট উপন্যাস। টা ১·৭৫

গল্প-উপন্যাস

আর এক জন্ম আর এক আকাশ

কল্যাণ জানা। গভীর মননশীল লেখকের মর্ম-স্পর্শী গল্পগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের মতো ছোট গল্পের স্বাদ, 'বনফুলের' মতো আঁটসাঁট বাঁধুনি। টা২·৭৫

অগ্নির দেবতা হেফেসটাস

ডকটর দিলীপ রায়চৌধুরী। বিজ্ঞানী নীরেন পাগলের মতো হয়ে গেলেন, ডম্‌ব্রোভসকি ও জনসনের ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ থেকে বেরুলো···কী ভয়ঙ্কর! ভারতের মাটিতে পারমাণবিক গবেষণার ভিত্তিতে লেখা রকেট উপন্যাস। টা ১·৭৫

এক সমুদ্র দুটি মন

ান্তিভূষণ রায়। অ্যাল্‌ফা-বিটা গ্রন্থ প্রতি-াগিতায় বিশেষ পুরস্কারবিজয়ী কবির স্বতন্ত্র াতিভায় উজ্জ্বল কাব্যগ্রন্থ। 'অকৃত্রিম কবি'—: হরপ্রসাদ মিত্র, প্রেসিডেনসী কলেজ। মকপট'—আনন্দবাজার। 'নিশ্চিন্ত সহজ াবলীল'—ধ্রুপদী। টা ২·৭৫

যে নদী রাত্রির

্যকটর দিলীপ নাথ। দুঃখের আতিশয্য ও াবপ্রবণতার ঊর্ধে মানুষের হৃদয় ও বুদ্ধির রৌদ্র-চেতনাই এই কাব্যের প্রধান উপ-ীব্য। 'যথেষ্ট বলিষ্ঠতার পরিচয়, মনোরম' —অমৃত। টা ৩৲

পত্রলেখা

ামাখ্যাশঙ্কর গুহ। প্রবীণ কবির আবিষ্ট াব্যচেতনা। 'আবেশবিভোর স্নিগ্ধ মাধুর্য'—গান্তর। 'যেমন সংহত, তেমনি বাগ্‌দীপ্ত' —দেশ। 'ঠিক এই ধরনের মাধুর্য ও কাব্যিক স্নিগ্ধতা ইদানীংকালের কাব্যে বড় একটা চোখে পড়ে না'—ধ্রুপদী। টা ২·৭৫

দীপশিখা দ্যুতিময়

বিনয় মিশ্র। অ্যাল্‌ফা-বিটা গ্রন্থ প্রতি-যোগিতায় বিশেষ পুরস্কার বিজয়ী। স্প্রাং রিদ্‌ম্ গোছের নতুন প্যাটার্নে লেখা। 'একটা স্নিগ্ধ মাধুরী বিদ্যমান'—যুগান্তর। টা ৩৲

কবিতা

অভিজ্ঞান শকুন্তল

মহাকবি কালিদাস। অনুবাদ : কালীপদ দাস পুরাণরত্ন। 'এমন সুললিত অনুবাদ পূর্বে কেহ রচনা করেন নাই। সমগ্র নাটকের পদ্যানুবাদ এই প্রথম'—ডঃ সাতকড়ি মুখো-পাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। টা ৫·৭৫

ফুটবে আবার ফুল

অনিল কুমার বিশ্বাস। মা ও সন্তানের সুমধুর ভাবের চমৎকার কাব্যময় প্রকাশ। 'সহজ সরল ভাষায় জীবন যন্ত্রণার অব্যক্ত আকুতি'—যুগান্তর। 'খুবই চিত্তাকর্ষক'—অমৃত। 'চমৎকার'—বসুমতী। টা ৫৲

ঋষভ গান্ধার

সত্যব্রত বসু। অ্যাল্‌ফা-বিটা গ্রন্থ প্রতি-যোগিতায় পুরস্কৃত মর্মস্পর্শী কাব্যগ্রন্থ। স্নিগ্ধ তৃপ্তিকর অমৃতরসের মত আদরণীয়। 'মধুর উত্তাপ'—নরেন্দ্র দেব। 'প্রশংসনীয়'—বসুমতী। 'ভালো লাগার আবেগ……মনের বৃত্ত ছুঁয়ে যায়'—ধ্রুপদী। টা ২·৫০

খনি খামার

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। খনি অঞ্চলের মানুষদের জীবনধারা অবলম্বনে এই সহজ সরল কবিতা গ্রন্থটি সমাজের একটি অবহেলিত অথচ গুরুত্বপূর্ণ স্তরের পরিচয় দিচ্ছে। টা ৩·৭৫

কবিতা

চাবুক

বিভূতিভূষণ সরকার। মানুষ আজ কোথায় এসেছে, কোথায় চলেছে…অভিজ্ঞ কবি তার সুস্পষ্ট চাঞ্চল্যকর রূপছবি এঁকেছেন। 'উপভোগ্য……কবিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি'—কবিশেখর কালিদাস রায়। টা ২·৫০

তুষার থেকে সাগরে

শ্যামল বিহারী সরকার। অপরূপ স্বাধীন ছন্দে মুক্ত ভাবস্পন্দনে শিহরিত পঁয়ত্রিশটি সুসংবদ্ধ কবিতা-সৃষ্টি। 'আবেগ আছে, পড়তে ভালই লাগবে'—আনন্দবাজার। 'কবিতাগুলির রস গাঢ়তর, ছন্দে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন'—দেশ। টা ২৲

আবার ভোর পেরিয়ে

অমিয়কান্তি দাশ। যন্ত্রণার দূরতম পাল্লার আলিঙ্গনাবিষ্ট হয়েও বেরিয়ে আসার দৃঢ়তা এই কাব্যে সুস্পষ্ট। কবির জীবনে আলোড়ন এসেছে অন্ধকারের সিঁড়ি বেয়ে, তবু তিনি পান না ভয় সে উদ্যত ছোবলকে। টা ৪৲

আমরা গেঁথেছি মালা

শালা মল্লিক সম্পাদিত। নব্য চিন্তার প্রায় ৫০ জন কবির বিভিন্ন স্বাদের বিচিত্র আঙ্গিকে রচিত একটি করে কবিতার মনোরম সঙ্কলন। অ্যাল্‌ফা-বিটা কবিতা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত। টা ৪৲

ছড়া

নীল ঝিল

অজয় চক্রবর্তী। ছন্দোময় ছড়ার বই। ধবধবে অফ্‌সেট কারট্রিজে বহুবর্ণে ছাপা। বিমল দাস চিত্রিত তিনরঙা মলাট। টা ২·৫০

তিন অঙ্গে এক অঙ্গ

গল্প-উপন্যা

রাধাগোবিন্দ দাস। দীর্ঘ, বিস্তারিত এ উপন্যাসটি প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লাইন থেকে মনকে কেড়ে নিয়ে রাখে। গল্প বলার ভঙ্গী সরস, বাস্তব, জীবন্ত। টা ৫·৫

কবিত

প্রথম কবিতা

'পুরুষোত্তম'। নবীন কবির উৎস অভিজ্ঞতা ও বিচিত্রমুখী চেতনার ধারাপ্রবাহ 'এমন তীব্র-সরল আর্তি প্রকাশ পেয়েছে, পাঠককে বিচলিত করবে'—যুগান্তর। 'দুর্বা অন্তপ্রেরণা'—ধ্রুপদী। 'মধুর'—কথাসাহিত্য টা ২

মুক্তি সংগ্রাম

নাট

অজিতকুমার সেনগুপ্ত। 'সিপাহী বিদ্রে হের পটভূমিকায় রচিত নাটকটিতে ঐতিহাসি চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবে জাগাবে।'—যুগান্তর। ২য় সংস্করণ টা

যমালয়ে ১৯৯৭

নকুল মুখোপাধ্যায়। এক দৃশ্যপটে দুই সম্পূর্ণ প্রহসন নাটক। পড়ুন—আনন্দ অভিনয় করুন—হল ফেটে পড়বে!

নতুন জীবন

অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। কেমন করে এক ছি মূল ভদ্র পরিবার সংগ্রাম জীবনে উত্তীর্ণ চাইছে, তারই নাটকীয় প্রতিরূপ। টা ৪

অমৃতস্য পুত্রা

সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। একটি মহৎ মানুষের সমাজসেবা এবং তাঁর গার্হস্থ্য সুখ দুঃখ ভোগতৃপ্তির সংগ্রাম নিয়ে সর্বকালজয়ী অভিনয়-সফল নাটক।

আশ্চর্য!

য়ারী ১৯৬৮-তে এর গৌরবময় চতুর্থ র্ষ সুরু! প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রীসত্যজিৎ য়। উপদেষ্টামণ্ডলীতে আছেন পদ্মশ্রী মেন্দ্র মিত্র। শ্বাসরোধী চমকপ্রদ গল্পকল্প ন্যাস, কার্টুনের নতুন ধরনের পত্রিকা— রা ভারতে এর জুড়ি নেই। এস. এফ. নে ক্লাবের মুখপত্র। সম্পাদক আকাশ সেন। ষিক চাঁদা ৯৲ টাকা; প্রতি সংখ্যা ৭৫ সা। এজেন্সী কমিশন ২৫% (এজেণ্ট ত হলে ২৲ টাকা জমা রেখে প্রতিমাসে মপক্ষে ৫ কপি অর্ডার দিতে হয়)। উজ্জ্বল"—আনন্দবাজার। "পথ-প্রদর্শক"— মল মিত্র।

সুখী মন

ান উদ্দীপনাময় মাসিকপত্র আর একটিও ই বাংলাদেশে যাতে মনের কথা, সাফল্যের া, সমস্যার কথা, প্রশ্নের জবাব পাবেন। পনার জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ াবে। সম্পাদক অসীম বর্ধন, এম. এ., . এড। বার্ষিক চাঁদা আড়াই টাকা ; প্রতি সংখ্যা ২৫ পয়সা। এজেন্সী াশন ২৫% (এজেণ্ট হতে হলে ২৲ জমা থ প্রতিমাসে কমপক্ষে ১০ কপি অর্ডার ত হয়)। "ব্যাপক জনপ্রিয়"—আনন্দ- ার। "অভিনব, উপভোগ্য, প্রয়োজনীয়" সুমতী।

বাঁচতে সবাই চায়

অসীম বর্দ্ধন। শিক্ষক, নেতা, অফিসার, ক্যানভাসার, ব্যবসায়ী, সংগঠক প্রত্যেকেরই জানবার মত সংক্ষিপ্ত বাহুল্যবর্জিত পরামর্শ এতে আছে। 'চমকপ্রদ, মনোরম'—আনন্দ-বাজার। উপন্যাসের চেয়ে আকর্ষণ'—যুগান্তর। 'উল্লেখযোগ্য'—দেশ। 'বাঁচতে যাঁরা চান, এই গ্রন্থপাঠে উপকৃত হবেন'—ভারতবর্ষ। ২য় সংস্করণ টা ৩·৭৫

পূর্বপক্ষ

'জৈমিনি'। সরল টীকা-টিপ্পনী সহযোগে বহু-তল বাস্তবের সুস্পষ্ট চাঞ্চল্যকর মর্মোদ্ঘাটন। 'শ্লেষ - ব্যঙ্গ - পরিহাস - হাস্যরসের মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ'—যুগান্তর। 'আশ্চর্য স্নিগ্ধতা'—পরিচয়। টা ৪৲

ওঙ্কার কথামৃত

কিঙ্কর অজিতকুমার। প্রখ্যাত সাধক শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথ সীতারামদাসের 'নাম-গান' শক্তি সম্পর্কে অলৌকিক আশ্চর্য কাহিনী তাঁর বিশেষ প্রিয় শিষ্য ঘরোয়া ভাষায় লিখেছেন। টা ৪৲

প্রকাশিতব্য

যুগ্ম পুষ্প ও দুই সখী

সুহাসিনী দাস। এই দুটি নাটক ও নাট্যধর্মী সংলাপের মধ্যে অভিজ্ঞা শিক্ষাব্রতীর আদর্শ চিন্তাধারা একটি সত্যের স্নিগ্ধসুষমা সঞ্চারিত করেছে। টা ১·৫০

পাখীর চেতনা

সত্যব্রত রায়। ঝড়ের পাখীর ঝড়ে তো পথ হারাবার কথা নয়, মানুষের আশা-নিরাশার মধ্যেও চলে তার মানবসত্তার ফল্গু-ধারা—সুন্দর কাব্য-গ্রন্থটির এই মূল কথা। টা ৩·৫০

বেপথুমতী

সন্তোষ দাস। কবিতার ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়েছে এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতায়। পড়লে সত্যি তৃপ্তি পাওয়া যায়। টা ৩·২৫

সুস্মিতা তার নাম

দীপঙ্কর পাঠক। এই উপন্যাসটিতে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় জাতিভেদরূপ কুসংস্কার প্রাকারকে চূর্ণবিচূর্ণ করে লেখক ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত নূতন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছেন। টা ৮৲

প্রকাশিত

পাতার নাম জনম

বিমল কুমার ঘোষ। তরাইএর চা-শ্রমি দের জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে মিষ্টিম রোম্যান্টিক উপন্যাস।

আমন্ত্রণ

গ্রন্থকার! আপনি প্রকাশক খুঁজছেন? সাহিত্য-প্রতিভা এবং আকর্ষণীয় গ্রন্থের অ্যাল্‌ফা-বিটা সদা জাগ্রত রয়েছে। আমা পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন গ্রন্থ দ্রুত প্রকাশ দেশব্যাপী প্রচার এবং পরিবেশনার সুযে লাভ করছে।

আপনার লেখা প্রকাশযোগ্য কোন পাণ্ডু থাকলে এখনি আমাদের কাছে পাঠা দশ দিনের মধ্যে আপনার রচনা সম্প আমাদের সম্পাদকীয় রিপোর্ট এবং প্রকাশন সম্ভাবনা সম্বন্ধে অভিমত পাবেন; কো বাধ্যবাধকতা নেই। পাণ্ডুলিপি মনোনীত সত্বর প্রকাশনার চুক্তিপত্র দাখিল করা হবে

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্
পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

দূর থেকে মনে হয়েছিল প্রাণহীন পাথরের পিণ্ড···
কিন্তু এখন যেন সাপ কিলবিল করছে···

সাইরেন্‌স্‌ ওয়ার্লড

জয়ন্তী সেন

.....

কথা ছিল কস্‌মিক কাফের তেত্রিশ নম্বর কেবিনে চা খেতে খেতে অশান্ত আমাকে নতুন অ্যাডভেনচারের প্ল্যান শোনাবে।

ওর বাবা একজন নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এবং মহাশূন্য প্রদক্ষিণ করে কি একটা নতুন জগত আবিষ্কারের চেষ্টায় ঘুরতে ঘুরতে অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান। এই সাহসী মানুষটির ডায়েরী অশান্ত আমাকে কিছু কিছু পড়ে শুনিয়েছে। খুব সুরেলা কবিতার ভাষায় তিনি মহাশূন্যের যে সব বর্ণনা লিখে গেছেন, তা পড়ে অনেকদিন ধরেই আমাদের দুজনের মন এক অজানা অচেনা দূরের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেছিল।

কথা মতো ঘড়ির কাঁটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভারি কার্পেট মাড়িয়ে কস্‌মিক কাফের করিডর পার হয়ে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম, যার কালো দরজার পাল্লায় খুব উজ্জ্বল সাদা হরফে তেত্রিশ নম্বর খোদাই করা রয়েছে।

কস্‌মিক কাফে জায়গাটি খুব বিচিত্র। সাধারণতঃ মহাশূন্য থেকে পৃথিবীতে নামবার আগে অথবা মহাশূন্যে যাবার পথে আকাশযানগুলো এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব খুবই নগণ্য। পৃথিবীর মতোই এখানে মাধ্যাকর্ষণের চাপ স্বাভাবিক, রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী পৃথিবীর যে কোন দেশের মানুষকে তার পছন্দ মত খাদ্য অথবা পানীয় সরবরাহ করা হয়, টেলিভিশনে পৃথিবীর ছবি দেখানো বা বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংগীত শোনানোর ব্যবস্থাও আছে।

করিডরে যে দু-একজন মানুষকে দেখলাম তারা আমাকে সাধারণ পোষাক পরিচ্ছদ পরে ঢুকতে দেখে কিছু আশ্চর্য হোল। মুখোসের স্বচ্ছ আড়ালে তাদের বিস্মিত মুখের ভাবভঙ্গী দেখে অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি তেত্রিশ নম্বর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ম্যানেজারের ঘর থেকে এক অচেনা ভদ্রলোক প্রচুর বিরক্তি আর অসন্তোষ ভরা গলায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে এগিয়ে এলেন সঙ্গে সঙ্গে।

'এখানে আমার অ্যাপয়েন্টমেণ্ট রয়েছে।'

'কিন্তু মঁশিও—মিঃ, পৃথিবীর মানুষদের রঁাদেভুর জন্যে আমরা হোটেল খুলিনি—। কসমিক কাফে কেবল মহাশূন্যে আসা-যাওয়ার পথের বিশ্রামাগার—। খুব দুঃখিত, কিন্তু পাসপোর্ট ছাড়া এই হলে ঢোকার নিয়ম নেই—।'

অশান্তর দেরী দেখে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল। ওর বাবার নামে যে পাসপোর্ট আছে, তার জোরে ও নিজে এখনো সবখানে অবাধে ঢুকতে পারে। সেই ভরসায় আমি এখানে কতক্ষণ অনধিকার প্রবেশের সুযোগ পাব জানি না।

'বাইরে ওয়েটিং রুমে অবশ্য বসতে পারেন আরও কিছুক্ষণ—হতাশার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে ম্যানেজার সহানুভূতির সঙ্গে বললেন।

"আগে মিঃ মেটকাফ কিন্তু কখনো বাধা দেন নি।"

"দুঃখিত—। আন্তর্জাতিক নিয়মগুলো আরও কঠিনতর হয়েছে তার পরে—। আশা করি তিনজন খেয়ালী বৈজ্ঞানিকের গল্পটা আপনার মনে আছে, যারা পাশপোর্ট জাল করে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিলো এক উদ্ভট কল্পনার পেছনে—।"

তর্ক করে লাভ নেই। মিঃ মেটকাফের সবুজ চোখের তারায় যে কৌতুক ও প্রশ্রয়ের আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠত, আমরা তারই জোরে অনেক অ্যাড্ভেনচারের সুযোগ পেয়েছি। এখন এই নতুন মানুষটি একটি রোবটের উন্নততর সংস্করণ ছাড়া কিছু নয়। অগত্যা মনে মনে অশান্তর মুণ্ডুপাত করে ওয়েটিং রুমের একটি সোফায় গা ঢেলে বসে রইলাম সৌরজগতের আধুনিক মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে।

অশান্ত একটা প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের বাক্স রোবট কুলির মাথায় চাপিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঢুকল—। "সরি, আমার দেরী হয়ে গেলো—। তৈরী হয়ে এসেছ তো একেবারে?"

এবারে আমার হতবুদ্ধি হওয়ার পালা। কোথাও যে যাব, সে রকম প্ল্যান কিছু ছিল না।

"জানি মশাই—তোমার কল্পনার দৌড় ভালো করেই জানা আছে। তাই সব ব্যবস্থা করে এলাম একেবারে। এমন কি তোমার বাড়ীতেও খবর দেওয়া হয়েছে। দু মাসের মত রশদ নিয়ে এলাম, তাতেই এ যাত্রা হয়ে যাবে—।"

"কোথায় যাচ্ছি"—ফাঁপা হাওয়া ভরা গাউন চাপিয়ে, হাতে দস্তানা পরতে পরতে খুব নিরীহ মুখে তাকালাম। অশান্তকে ভালো করেই চিনি, কখন যে হঠাৎ খেপে উঠবে তার কোনো ঠিক নেই—। ভাগ্য ভালো আজকে ওর মেজাজের ব্যারোমিটারের কাঁটা আমার স্বপক্ষেই হেলেছে—।

"এখন নয়—" হঠাৎ ঠোঁটে আঙুল চাপিয়ে রহস্যজনকভাবে

হাসল অশান্ত, "তেত্রিশ নম্বরে চল—চায়ের বদলে একেবারে ডিনার খেয়ে নেওয়া যাক—।"

কোন কথা বলতে না দিয়ে অশান্ত আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে একেবারে তেত্রিশ নম্বরের দরজার কাছে এসে কলিং বেল টিপলো। স্লাইডিং দরজা নিজে থেকেই ফাঁক হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে আসবাব-পত্র বিশেষ কিছু নেই। একটি পালিশ করা টেবিল, মুখোমুখি দুটো চেয়ার। ফুলদানীতে টাটকা দুটি গোলাপের কুঁড়ি প্রায় ফুটতে চলেছে। তাছাড়া কাচের পাত্রে একগুচ্ছ টাটকা রস ভরা আঙুর—।

"বাঁচা গেলো—" ভারি গাউনটা গা থেকে নামিয়ে অশান্ত নরম কুশান মোড়া চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো—"এখন তিনটি ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিত। ঐ যে মঙ্গলগ্রহের ম্যাপের নীচে ইলেকট্রিক ঘড়িটা দেখছো ওর সময় অনুযায়ী আমরা রওনা হব—।"

"আমার ঘড়ির সঙ্গে তো মিলছে না—।"

"মিলবে কি করে"—আমার অজ্ঞতায় অশান্ত হাসল—"তুমি এখন পৃথিবীর অ্যাটমস্ফিয়ার না ছাড়ালেও, মাটি থেকে অনেক ঊর্ধে বসে আছ—। কাজেই যে গ্রহের দিকে যাত্রার ছক কাটতে বসছি, তার সময়টা মানতে হবে ত—।"

"তুমি মার্সে যাবে—" একটা ভদ্রগোছের দেশে অশান্ত যাবে, এ যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার মনের ক্ষীণতম আশাকে সমূলে উৎপাটিত করে অশান্ত হো হো করে হেসে উঠলো। ইতিমধ্যেই পকেট থেকে একটা লম্বা মত খাম বের করে আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—"তুমি আমার বাবার চিঠিটাপড়। আমি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিই। এরপরে কত ঘণ্টা যে ঘুমোতে পারব না, তার ঠিক নেই। এই যে লাল বোতামটা দেখছো, এটা টিপলে কেবিন বেয়ারা আসবে। চা, কফি অথবা স্পেশাল কসমিক

ড্রিঙ্ক যা খেতে ইচ্ছে করে অর্ডার দিও।"

ঘরের এক পাশে একটি ডিভানে অশান্ত শুয়ে ঠিক এক মিনিটের মধ্যে নাক ডাকতে শুরু করল। আমার এখন চিঠি না পড়ে আর উপায় নেই। অশান্তর বাবা শেষ তিন মাস খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কোনো একটি অজানা অদৃশ্য বীজাণু ওর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে জীবন শুষে নিচ্ছিল, যার আকৃতি বা প্রকৃতি সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ এখনও অজ্ঞ। অসুস্থ অবস্থায় কাঁপা কাঁপা হাতে লেখা চিঠিটি বীজাণুশোধক অষুধে বার বার ধোয়া হয়েছে বলে হরফগুলো মুছে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। অনেক কষ্টে পড়লাম—প্রিয় অশান্ত, এটাই বোধ হয় আমার শেষ চিঠি, কারণ এর পরে আমার হাতের আঙুলগুলিও অবশ হয়ে পড়বে, তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কে যেন একটু একটু করে আমার শরীর থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে। আগে এক ঘণ্টা অন্তর রক্ত দেওয়া হোত, এখন পনেরো মিনিট—। আর কতদিন রক্ত দিয়ে একটা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? বিশেষ করে আমার অসুখটাই কোন ডাক্তারের দল ধরতে পারছে না।

তোমার কাছে শেষ বারের মত কতগুলো কথা বলার ছিলো। একমাত্র আন্তর্জাতিক স্পেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ও দু-চারজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছাড়া মাঝে মাঝে আমার রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার প্রকৃত রহস্য কেউ জানত না। মঙ্গল গ্রহ লক্ষ্য করে একশ বছর আগে কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে ছাড়া হয়েছিলো। তাদের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব এখনও পর্যন্ত টিকে আছে কিনা এবং থাকলেও কি ভাবে আছে, তারই একটি গোপন দলিল তৈরী করছিলাম। হয়তো ভাবছ গোপনীয়তার প্রয়োজন কি? আন্তর্জাতিক কোড বা নিয়ম অনুযায়ী যে কোন একস্‌পেরিমেণ্ট সফল না হওয়া পর্যন্ত

আমাদের সব কিছু গোপন রাখতে হয়।

পৃথিবী থেকে ছাড়া উপগ্রহ মোটামুটি সবগুলোই একই জাতের। প্রাণের অস্তিত্ব একটাতেও খুঁজে পাইনি। তবে গ্রীণফায়ার নামে একটি কৃত্রিম সবুজ উপগ্রহে ঠিক একশ বছর আগে লেখা একটি ডায়েরীর সন্ধান পাই। লেখকের নাম ডেভিড হিল—। জাতে ইংরেজ বলেই মনে হয়। সেই ডায়েরীতে লেখা ছিলো একশ গজের মধ্যে একটা আশ্চর্য আলো দেখতে পেয়ে ভদ্রলোক স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে সেই আলোকে অনুসরণ করেন। দূর থেকে একটা ছুঁচলো মুখ উল্‌কা পিণ্ডকে আলো ছড়িয়ে ঘুরতে দেখে তিনি আরও এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মঙ্গলগ্রহের আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত হবার আগেই যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য ফিরে আসতে হোল। ইলেকট্রনিক বেতারে তিনি এ সময়ে একটা অদ্‌ভুত শব্দ ভেসে আসতে শুনেছিলেন। সেটা ঝড়ের সমুদ্রের ঢেউএর অথবা কোন আদিম জাতির ঢাক ঢোলের আওয়াজ, তা বোঝা গেল না। ভবিষ্যতে কেউ যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে আগ্রহ দেখান, তাহলে তাঁর জন্যে শুভেচ্ছা রইলো।

বুঝলে অশান্ত, আমি তলে তলে এই আলো ছড়ানো উল্‌কা পিণ্ডটিকে খুঁজছিলাম। ২১শে জুন সেই গ্রীণফায়ার নামে উপ-গ্রহটির পাশে আবার আলোর নিশানা দেখতে পাই। আমার ট্রান্‌সমিটার আরও অনেক শক্তিশালী, তাতে একটা অদ্‌ভুত সুরের রেশ বার বার ভেসে ওঠে। অসুখ না হয়ে পড়লে হয়তো ওখানে পৌঁছে যেতাম একদিন, কিন্তু তার আগেই আগেকার পৃথিবীর কোনো দূরারোগ্য বীজাণু যা মঙ্গল গ্রহের অ্যাটমস্‌ফিয়ারে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আমাকে আক্রমণ করল। এ এক জাতীয় লিউকোমিয়া বলতে পারো।

তুমি যদি আমার মত অ্যাডভেনচার ভালোবাসো, তাহলে স্পেস

ফাইং ক্লাবের মেম্বার হয়ে নিও। মিঃ প্রেসিডেন্টকে বলে গেলাম, তিনি তোমাকে সব রকমে সাহায্য করবে।

যে শব্দটা শুনেছি, তা প্রাচীন গ্রীসের তারের বাদ্য যন্ত্র বা লায়ারএর ঝঙ্কারের মতো। কেন জানি মনে হচ্ছে শত সাইরেনের দল সেখানে তাদের রেশমী চিকণ চুলকে ছড়িয়ে বীণা বাজাচ্ছে অনাদি অনন্ত কাল ধরে। সে বীণার সুর আমাকে যেন পাগল করে তুলেছে। যদি খুঁজে পাও, তাহলে আমার অভিনন্দন জানবে। এই পৃথিবী আর এই বিশাল বিশ্বজগত অপূর্ব। জানি না মৃত্যুর পরে অন্য আর কোন জগৎ আছে কিনা, এবং তার প্রকৃত স্বরূপ কি! বিদায়, তোমার বাবা।

চিঠিটা পড়া শেষ হতে না হতেই অশান্তর ঘুম ভেঙে গেলো। আমি বোধহয় অনেকক্ষণ সময় নিয়ে অনেকবার চিঠিটা পড়েছিলাম, কারণ ঘড়িতে ইতিমধ্যে একটি পুরো ঘণ্টা নিঃশব্দে পার হয়ে গেছে।

"আমি জায়গাটার নাম দিয়েছি সাইরেন্'স ওয়ার্লড। তোমাকে বলিনি, স্পেশাল মহাজাগতিক যান আমাদের জন্যে তৈরী, টেলিভিশন ক্যামেরা, টেপ রেকর্ড সব ব্যবস্থাই নিখুঁত। আর এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের যাত্রা হবে শুরু। ডিনার খেয়ে নেওয়া যাক ভালো করে।"

আমি আপাততঃ স্পেস যুগের গোড়ায় পৃথিবীর মানুষের সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে একটি থিসিস লিখতে ব্যস্ত। কাজেই অশান্ত এই দুঃসাহসিক যাত্রার সঙ্গী হতে আমাকে কেন ডাকলো বুঝতে পারিনি।

"সাইরেনের গল্পটা জানো?"

ইতিহাস আমার সাবজেক্ট, অতএব প্রশ্ন শুনে বিরক্তিসূচক কাঁধ ঝাঁকুনি দিলাম ফরাসী কায়দায়।

"তাদের গান শুনলে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করার জন্যে ছোটে। ঝুঁকি নিতে চাই না বলে তোমায় কিছুক্ষণের জন্যে শ্রবণ শক্তিকে

বিসর্জন দিতে হবে ভাই। যন্ত্রযানের কনট্রোল থাকবে তোমার হাতে। আমি বাঁধা থাকবো ম্যাগনেটিক কর্ড দিয়ে, কিন্তু আমার চোখ কান থাকবে খোলা। সাইরেনদের পৃথিবী ঘুরে ফিরে এসে তারপর আমি ওদের প্রভাব মুক্ত হয়ে এই আশ্চর্য অ্যাডভেনচারের কাহিনী লিখব।"

এতক্ষণে অশান্ত মনের ইচ্ছার স্বরূপ বুঝতে পারলাম। অতীত নিয়ে নাড়াচাড়া করি বলে অনেকের ধারণা আমার কল্পনা শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়নি। তবে যাঁরা আমার মতো ইতিহাসের পাতায় ডুবে থাকতে ভালোবাসেন, তাঁদের সকলেরই মতে সেই আদিম যুগেও মানুষের জীবনে বহু রোম্যান্স ও বৈচিত্র্য ছিলো। যেদিন তারা প্রথম লড়তে আকাশে শিখল, তাদের আনন্দ উন্মাদনা আমাদের একটি নূতন সৌরজগত আবিষ্কারের চাইতে এক বিন্দুও কম ছিল না। অথচ অশান্তকে সে কথা বোঝানো অসম্ভব। পোকায় খাওয়া জীর্ণ পুঁথির মত সমস্ত অতীতকে সে এক কথায় অগ্রাহ্য করে দিতে চায়।

আমাকে নির্বাক হয়ে বসে থাকতে দেখে অশান্ত এবারে কর্ম তৎপর হয়ে উঠল। সুইচ টিপে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবিন-বেয়ারার ধূমায়িত ট্রে হাতে আবির্ভাব—চোখের সামনে দেওয়ালের পর্দা সরে টেলিভিশনে পৃথিবীর অন্তরঙ্গ ছবি দেখানো হচ্ছে। প্রত্যেক মহাকাশ যাত্রী ঠিক যাত্রার মুহূর্তে পৃথিবীকে আর একবার দেখে নিতে চায়, এ মনস্তত্ত্ব কাফে মালিকের খুব ভালো করেই জানা আছে। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে আমাকে অন্যমনস্ক হবার সুযোগ না দিয়ে অশান্ত চটপট তৈরী হয়ে নিলো।

যে সবুজ রঙের টু-সিটার রকেট যানটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, তার মসৃণ গায়ে গ্রীণফায়ার-টু বেশ বড় করে লেখা। কসমিক কাফের রোবট সদৃশ ম্যানেজার এগিয়ে এসে অশান্তকে এবং সে সঙ্গে আমাকেও হাসি মুখে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করে ফিরে গেলেন।

কেবিনে সিটে তারপর পাশাপাশি আমরা দুজন। বাইরে অন্ধকার, ঘন নিঃসীম অন্ধকার। ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল স্পিডে নক্ষত্র বেগে চলেছি। এখনও পরিবেশ চেনা, জানা, তবু বিস্ময়জনক দৃশ্যের কি আর শেষ আছে! হীরের কুচির মত একরাশ উজ্জ্বল পদার্থ প্রায় মেঘের মত আমাদের একবার ঘিরে ফেলল। একটা ধূমকেতু একবার তার দ্বিধাবিভক্ত পুচ্ছ নিয়ে প্রকাণ্ড বুনো জন্তুর মত গাঁক গাঁক করে তেড়ে এলো, তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া এক ব্যাপার। অশান্তর অবশ্য প্রায় জন্ম থেকেই হাতে খড়ি হয়েছে, কাজেই রকেট চালানোর দক্ষতা সম্পর্কে কিছু বলার নেই। সুইচ-বোর্ডের বিভিন্ন কলকবজা এমন নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করতে আমি খুব কম এমেচার ড্রাইভারকে দেখেছি।

"মার্সের এলাকায় এলেই কিন্তু তোমাকে কাণে সাউণ্ড প্রুফ যন্ত্রটা পরে নিতে হবে ঐতিহাসিক, কাজেই তার আগে বোবা হয়ে বসে না থেকে একটু রসালাপ করলে ক্ষতি কি?"

"আমি পৃথিবীর প্রথম মানুষের কথা ভাবছি, রাত্রিবেলা আকাশে তারা উঠতে দেখে সে কি ভেবেছিলো!"

"আমরা যা ভাবছি তাই—" অশান্তর ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক খেলে গেলো "আমরা যা সবাই ভাবি, রোজই ভাবি, কি করে, কখন কে এই অনন্ত অপার বিশ্বজগত সৃষ্টি করল—সে রহস্য কবে উন্মোচিত হবে—!"

"নিউটন নামে এক প্রাচীন বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন জ্ঞান সমুদ্রের তীরে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি—"

"দু এক পা হয়তো এগিয়েছি, কিন্তু সমুদ্র এখনও অনেক দূরে—। তা নিয়ে আপশোষ করে কোনো লাভ নেই। বরং দু চারটে দরকারী কথা তোমাকে বলে নিই। যে নতুন একটা দ্বীপে চলেছি আমরা নিশ্চয় মনে আছে তার নাম দিয়েছি সাইরেনস্ ওয়ার্লড। অস্তিত্ব এখনও কোনো মানুষ জানে না, ওখানকার অ্যাটমসফিয়ার কি হবে,

তাও বলতে পারছি না। আমার ইচ্ছে তুমি বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে অপেক্ষা করে থাকবে। আমার কোমরে বেল্ট দেখছো এটার সঙ্গে ম্যাগনেটিক কর্ড পাকে পাকে বাঁধা। পোর্টহোল দিয়ে ঠিক পনেরো মিনিটের জন্যে আমাকে নামিয়ে দিও। তারপরে ফিরতে না চাইলেও জোর করে আমাকে টেনে নিয়ে আসতে হবে, সে কথা ভুলো না। তোমাকে অবশ্য নিস্ক্রিয় হয়ে থাকতে বলছি না। কাণে শুনতে না পেলেও চোখ দুটো খোলা রেখে সব কিছু নোট করে নিও। আমার যদি কিছু হয়, তাহলে তুমি চাক্ষুষ বিবরণ একটা দিতে পারবে পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে—।"

"তোমার কিছু হবে মানে?" ঘাবড়ে গেলাম অশান্তর কথায়। বিশাল লম্বা চওড়া অ্যাথলেটিক চেহারা, কোনো দিন ভয় পেতে বা নৈরাশ্যজনক কথাবার্তা বলতে ওকে শুনিনি।

"জীবন মাত্রই রিস্ক—" অশান্ত হাসলো। কথা বলছে কিন্তু ওর শরীর মন অন্য এক উত্তেজনায় এখন উন্মুখ হয়ে আছে—। শারীরিক বা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা প্রচুর—সে কথা নাকি স্পেশালিষ্ট বার বার বলেছে। সাবধান করে দিয়েছে অবশ্য যদি সাইরেন্‌স্ ওয়ার্লড বলে সত্যিই কোন কিছু থাকে। ইনটার ন্যাশানাল স্পেস কমিটির প্রত্যেকটি মেম্বার সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে রকম একটা জগত আদৌ থাকা সম্ভব নয়। ডেভিড হিলের হয়তো মানসিক সুস্থতা ছিলো না, আর অশান্তর বাবাও কোনো একটা কাল্‌পনিক স্বপ্নকে সত্যি বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

নিস্তব্ধতার ভারি পর্দা নিজের চারিদিকে টেনে নিয়ে অশান্ত তন্ময়তার গভীরে তলিয়ে গেলো। আমরা এক ভাবেই এগিয়ে চললাম। কিছু জমানো জেলি আর টিউবে রক্ষিত ফলের রস খেয়ে ইতিমধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণার বোধটুকু মিটিয়ে নেওয়া হয়েছে। যন্ত্রপাতির ভার এখনও অশান্তর হাতে। সিটের একপ্রান্তে মাথা হেলিয়ে কাচের স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে আধঘুমে আধ জাগ্রত অবস্থায় আলোছায়ার

অপার্থিব খেলা দেখতে দেখতে বোধহয় তন্দ্রার ঘোরে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ একটা উজ্জ্বল লাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে ঘুম ভেঙে গেলো। কাচের থেকে অন্ধকারের কালো রং মুছে এখন চারিদিক লালে লাল।

"এবার ওঠ হে—আমরা মঙ্গলগ্রহের এলাকায় পৌঁছে গেছি।" অশান্ত কাঁধে ধাক্কা মেরে তুলে দিলো আমাকে।

"এবারে কোন্ দিকে যাবে?" ঘুম জড়ানো চোখ মেলে ধরমড় করে করে সোজা হয়ে উঠে বসলাম।

"কম্পাসের কাঁটার গতিবিধি লক্ষ্য করে একেবারে যান্ত্রিক ভাবে আমরা এগোব। চার্টে সব পরিষ্কার করে লেখা আছে। কিন্তু তোমাকে এবারে একটু কষ্ট করতে হবে।"

কিছু বলার আগেই কানে দুটো প্লাগ লাগিয়ে দেওয়া মাত্র অদ্ভুত একটা নৈঃশব্দের জগতে তলিয়ে গেলাম যেন। কেউ কোন কথা না বললেও এতক্ষণ কানে নানা রকম শব্দ ভেসে আসছিলো। হঠাৎ আমার আর শব্দের জগতে মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে উঠলো—আর আমি কিছুতেই তাকে পেরিয়ে যেতে পারলাম না।

অশান্ত ইতিমধ্যে আমার হাতে কনট্রোল বোর্ডের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিজে তৈরী হওয়ার উদ্যোগ শুরু করল। রোবটের মত কোন কিছু না ভেবে আমাকে এখন সুইচ টিপতে হবে, বাঁয়ে, ডাইনে, চার্টের নির্দেশ অনুসারে। আর নজর রাখতে হবে কোনো কিছু অস্বাভাবিক বস্তুর আবির্ভাব ঘটছে কিনা। বাইরের দৃশ্যপটের চেয়েও আমি কিন্তু অশান্তর দিকে লক্ষ্য রাখছিলাম। অক্সিজেন সিলিণ্ডার কাঁধে বসিয়ে শীততাপনিয়ন্ত্রিত পাতলা ধাতব পোষাক চড়িয়ে মনের উত্তেজনা দমন করার জন্য গোটা চারেক লাল নীল বড়ি খেয়ে নিলো অশান্ত। নামবার আয়োজন সম্পূর্ণ, এখন কেবল

অপেক্ষা করতে হবে। বেশ বুঝতে পারলাম একাগ্রতার সঙ্গে ও শব্দগ্রহণকারী শক্তিশালী বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে চলেছিলো, যদি সাইরেন সুন্দরীদের বীণার সুরতরঙ্গ ভেসে আসে। বোধহয় কিছুই শুনতে পায়নি, কারণ ওর মুখের ভাবে হতাশার ছাপ ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। এক-একবার চোখ তুলে চার্টের সঙ্গে আমাদের গতি মিলিয়ে দেখছিলো ঠিক পথে চলেছি কিনা দেখার উদ্দেশ্যে—।

"যাত্রাটা বোধহয় নিষ্ফল হোল—" নিজের মনেই আক্ষেপ করলাম একবার। অশান্ত শুনল। বিরক্তির খাঁজ কপালে ফুটিয়ে কি যেন বলল, শুনতে পেলাম না। কাগজে খস খস করে লিখে চিরকুটটা যখন এগিয়ে দিলো—দেখলাম—ও বলছে—

তুমি একটি আস্ত গর্দভ—অতএব কথা বলে আমাকে বিরক্ত কোর না।—উত্তর দিতে গিয়ে দেখি অশান্ত আবার যন্ত্রটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। ওর নিস্তব্ধ শরীরটা দেখে আমার একটা পাথরের নিষ্প্রাণ মূর্তির কথাই বার বার মনে হতে লাগলো—।

তার হঠাৎ সেই মূর্তির ভেতর প্রাণের সাড়া জেগেছে, দেখে চমকে উঠলাম। একি করছে অশান্ত—! ও কি পাগল হয়ে গেল! লক্ষ্য করলাম ওর চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখে উন্মাদ মানুষের চাউনী। হাতের মুঠি একবার খুলছে আর বন্ধ করছে, পা দুটো থর থর করে কাঁপছে।

"কি হয়েছে অশান্ত—" যতটা সম্ভব গলা চড়িয়ে বললাম। বুদ্ধি এখনও হারায় নি, তাই কাঁপা হাতে কাগজে লিখলো—"আমি শুনেছি। সেই আশ্চর্য সুর আমার মনের মধ্যে কি যে তোলপাড় শুরু করেছে, তা কেমন করে বোঝাবো। কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছি না। আমাকে নামিয়ে দাও—দোহাই তোমার—নাহলে পাগল হয়ে যাব।"

কম্পাসের কাঁটার দিকে তাকিয়ে এবারে আমি সজোরে

স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নিলাম। ঠিক তখুনি কাচের মধ্যে একটা অদ্ভুত ছুঁচলো মুখ দ্বীপের আভাস ফুটে উঠলো। কালো অন্ধকারের মধ্যে ফিকে চাঁদের আলো মাখা একটি জড় বস্তুপিণ্ড। আমার প্রথম দর্শনে মনে হোল এটি একটি পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ কোথাও কোন প্রাণের আভাস দেখা যাচ্ছে না। অশান্ত কিন্তু ক্রমেই দিশাহারা হয়ে উঠছে। যন্ত্রটাকে দুহাত জড়িয়ে মাথা ঠুকছে কখনো, আবার তারপরেই শুরু হচ্ছে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ওঠার চেষ্টা। কোমর পর্যন্ত যে বেঁধে রাখা হয়েছে, সে খেয়াল পর্যন্ত নেই—।

"ও রকম করছ কেন—! একটু স্থির হও—!"

"আর পারব না—প্লিজ, আমার কোমরের কর্ড আলগা করো, পোর্টহোলের চাবী তোমার কাছে। খুলে দাও—নইলে—" লিখতে লিখতে হঠাৎ ওর হাতে পায়ে যেন খিঁচুনি ধরলো। আমরা ততক্ষণে সাইরেন্‌স্ ওয়ার্লডএর কাছাকাছি এসে পড়েছি।

দূরবীণে চোখ দিয়ে কি যেন সেদিন দেখেছিলাম, ঠিক গুছিয়ে বলা যায় না। দূর থেকে মনে হয়েছিলো প্রাণহীন পাথরের পিণ্ড। কিন্তু এখন যেন অসংখ্য সাপ কিলবিল করে ঘুরছে, এমনি একটা আতঙ্ক আমার চোখের সামনে বিভীষিকার মত ফুটে উঠলো। ওগুলো কি সত্যিই কোনো জীবন্ত প্রাণী? ক্যামেরার যন্ত্র চালু করতে হবে, টেপ রেকর্ডের মেশিন ঘুরিয়ে দিতে হবে, সে সব দায়িত্বের কথা বেমালুম ভুলে আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম গ্রীণফায়ার-টু নিজে থেকেই একটু একটু করে নীচের দিকে নামছে। অর্থাৎ ঐ বীভৎস দ্বীপের মাধ্যাকর্ষণের টানে পড়ে গেছি আমরা। অশান্তর বাবা কল্পনা করেছিলেন সাইরেন-রমণীদের ঢেউ খেলানো চুল। আমি দেখছি হাল্‌কা সবুজ রঙের কোনো এক সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী অথবা লতানো উদ্‌ভিদ যেন ক্ষুধার তাড়নায় ছটফট করে উঠছে।

এদিকে অশান্তর অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠল। চোখ

কপালে, মুখের দু পাশ দিয়ে ফেণা গড়াচ্ছে, সমস্ত শরীর ধনুকের মতো বেঁকে গেছে—।

আমি এখন কি করব? হায় ভগবান, মৃত্যু কি এভাবে গ্রাস করে করে ফেলবে আমাদের? শেষবারের মত অদৃশ্য হাতছানি থেকে চোখ ফিরিয়ে আমি কনট্রোল বোর্ডের সুইচগুলো টিপতে শুরু করলাম। কোন্‌টা টিপলে কি হবে, সে বোঝার ক্ষমতাও আমার তখন ছিল না। গ্রীণফায়ার-টু তার অনিবার্য পতনের পথে ধাপে ধাপে এগোচ্ছে। জানি না কি করে ঠিক সুইচে হাত পড়েছিল, হঠাৎ বোঁ করে যন্ত্রটা উল্টো দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ভীষণ স্পিডে সাইরেন জগতের বিভীষিকা থেকে অন্য দিকে ছুটে চললো। চার্ট এখনো আমার সামনে—মঙ্গল গ্রহ ছাড়িয়ে প্রথম যে স্পেস ষ্টেশন পড়বে, তাতে পৌছতে পারলেই আমার ছুটি।

S. O. S মার্কা আলোর নিশানা ছড়াতে ছড়াতে আমি প্রাণ-পণে পালিয়ে যাচ্ছি। কাণে এখনও সেই সাউণ্ডপ্রুফ যন্ত্র, সে কথা মনে নেই। অশান্ত এলিয়ে পড়ে আছে নিঃসাড় হয়ে। ও বেঁচে আছে কি না জানি না। উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীরেও যেন ইলেকট্রিক কারেণ্ট বয়ে যাচ্ছে।

তিন চারটে স্পেস-হেলিকপ্টারের নীল সবুজ স্পট লাইটের চিহ্ন দেখতে পেয়ে গ্রীণফায়ার-টুর তীব্র গতি কমিয়ে ধীরে ধীরে ষ্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ালাম। কেবিনের দরজাটাও বোধ হয় আমিই খুলে দিয়েছিলাম—কিন্তু তারপরে আর কিছু মনে নেই।

পরে সাইরেন্‌স্ ওয়ার্লড সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে দেখেছি একথা দু চারজন ছাড়া কেউই মানতে চান না। মহাশূন্যে নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে এগোলে নাকি মানুষের মনে নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পরে সে তখন অনেক আজগুবী দৃশ্য দেখতে পায়। তবে আমার বক্তব্য রেকর্ড করে রাখা হোল, ভবিষ্যতে ওদিকে হয়তো আরও শক্তিশালী মহাকাশ যান

পাঠানো হবে।

অশান্ত এখনও মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায়নি। শুনেছি অতীত স্মৃতিকে মগজ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার আয়োজন করা হচ্ছে। তারপরেও সুস্থ হয়ে উঠতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না।

২য় সংস্করণ পড়েছেন ?

বাঁচতে সবাই চায়

অসীম বর্দ্ধন

জীবনের সার্থক পরিতৃপ্তি লাভের
একান্ত ঘরোয়া আলোচনা

'উপন্যাসের চেয়েও মনকে আকর্ষণ করে'—যুগান্তর। 'গল্পের মেজাজ এনে লেখক অনেক চমকপ্রদ তথ্য জানিয়েছেন মনোরমভাবে'—আনন্দবাজার 'গল্প ছেড়ে পড়তে ইচ্ছে করে···প্রেরণা ও উৎসাহও প্রচুর লাভ করা যায়' —বসুমতী। 'এ ধরনের বই সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় দেখা যায় না।' —অমৃত।

রঙীণ আর্ট জ্যাকেটে মোড়া ; দাম টা ৩·৭৫
(ডাক ব্যয় ৮১)

*

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্‌
৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

তিন-তিনটে খুনের দায়িত্ব তাঁর···থিসিস লিখে পি. এচডি. পেয়ে গেলেন!

পিশাচী

দেবব্রত চ্যাটার্জী

এক

"আপনি কখনো খুন করেছেন?"

প্রশ্ন শুনে ঘুরে তাকালাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে সবেমাত্র আলাপ হয়েছে। ফার্স্ট ক্লাশ কুপেতে আমরা দু'জন যাত্রী। রাতের অন্ধকারের ভেতর ট্রেণটা হু হু করে ছুটে চলেছে।

মনে হ'ল ভদ্রলোক ঠাট্টা করছেন। তাই হেসে জবাব দিলাম, "না, সে সৌভাগ্য এখনও হয় নি।"

"ভুল করছেন মশাই। সেটা কখনই সৌভাগ্য নয়, আমি কিন্তু খুন করেছি, তিন তিনটে।"

বুকটা ধড়াস করে উঠলো। জীবনে কখনও খুনী দেখি নি। মনে হ'ল এই নির্জন কুপেতে একজন খুনীর সঙ্গে ভ্রমণ করছি। বলা যায় না যদি—

ভদ্রলোক আমার মনের কথাটা আঁচ করে বল্লেন, "ভয় নেই, আপনাকে খুন করব না। মানুষ মারা আমার ব্যবসা নয়। খুন-গুলো ঠিক আমার ইচ্ছাকৃত নয়, হ'য়ে গেছে। সিগ্রেট খাবেন?"

তিনি সিগরেট কেসটা আগিয়ে দিলেন। নিলাম একটা। সিগরেট ধরিয়ে তিনি বল্লেন, "আমি কাদের খুন করেছি শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য হবেন। প্রথমতঃ একটি মেয়েকে, দ্বিতীয়তঃ একটা বুড়ো সহিসকে আর শেষকালে আমার স্ত্রীকে।"

"স্ত্রীকে!"

"হ্যাঁ। শুনে আশ্চর্য হচ্ছেন মনে হচ্ছে। ভাবছেন এ যুগে স্ত্রীর অপরাধে কোনো স্বামী কি তাঁকে খুন করতে পারে? আসলে আমার স্ত্রীর কোনো অপরাধ ছিল না। তবু আমি তাকে খুন করেছি। সে অবশ্য ১৫ বছর আগে।"

"কেন?"

"কারণটা সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন না। কারণ হল আধুনিক বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞান?"

"হ্যাঁ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটা মানুষকে কি ভাবে অমানুষ করে তুলতে পারে তার উদাহরণ হলাম আমি। সেটা বলতে গেলে সব কথা আপনাকে শুনতে হবে। আপনি কতদূর যাবেন?"

"দিল্লী!"

"তাহলে হাতে অনেক সময় আছে। আপনি শুনবেন?"

"হ্যাঁ শুনবো।"

আরও একটা সিগরেট ধরিয়ে তিনি তাঁর কাহিনী শুরু করলেন। তাঁর জীবনীতেই গল্পটা শুনুন।

দুই

ছেলেবেলাতেই আমার মা আর বাবা মারা যান। মামার কাছে মানুষ হই। বাবা যে টাকা রেখে গেছলেন, আমার মামার কাছ থেকে তার কিছুই আমি পাই নি। বাবা একটা এজুকেশন ইন্সিওরেন্স করে গেছলেন, তাই কলেজে ভর্তি হ'তে পেরেছিলাম। কলেজ থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে।

কিন্তু গোল বাধল এম. এসসি. পাশ করার পর। আমি রিসার্চ করার জন্য ডাঃ মুখার্জীর কাছে কাজ শুরু করলাম। সেটাই হ'ল ভুল। ডাঃ মুখার্জী ছাড়া আর কারুর অধীনে কাজ করলে আমার জীবনটা অন্য রকম হ'ত।

সে যা হোক। আমি ওয়্যারলসে-এর ওপর রিসার্চ করছিলাম। সে সময়ে হঠাৎ নতুন একটা আইডিয়া আমার মাথায় এল।

আপনি জানেন যে, বেতারের সাহায্যে আজকাল অনেক অটোমেটিক যন্ত্রপাতি চালান হয়। তার ওপরে পড়াশুনা করতে করতে একদিন হঠাৎ মনে হল যে চেষ্টা করলে যে কোনো জীবজন্তুকেও ত' এই উপায়ে চালনা করা যেতে পারে। সেটা করতে পারলে আমি ফিজিক্সের নোবেল পুরস্কারটা অনায়াসে পেয়ে যাব। এই আবিষ্কার পৃথিবীর একটি বেশ বড় আবিষ্কার বলে গণ্য হবেই।

এখন আপনাকে বলতে বাধা নেই, আমি ঐ আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—সেটা প্রকাশ করতে পারি নি। প্রথমতঃ একটা বাঁদরের ওপরে পরীক্ষা চালিয়ে সফলতা পেলাম। তারপর সে যাকগে, সেটা যথা সময়ে বলব। প্রথমের কথা প্রথমে শুনুন।

ডাঃ মুখার্জী আমার রিসার্চ গাইড, তাঁর বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম।

মেয়ে রত্না, স্ত্রী আর এক ভাই—এই নিয়ে ডাঃ মুখার্জীর সংসার। আমি আমার কাজে যেতাম কাজ সেরে সোজা চলে আসতাম। পরিবারের কারুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিনি বা তার আবশ্যকতা হয় নি। একদিন ডাঃ মুখার্জী আমাকে বল্লেন, "তুমি রত্নাকে একটু অঙ্কটা দেখিয়ে দেবে?"

রাজী হতে হল। তিনি আমার রিসার্চ গাইড, তাঁর কথা অমান্য করা চলে না। কাজেই পরের দিন থেকে আমি রত্নাকে পড়াতে লাগলাম। রত্না বি. এসসি. পড়ে।

আমি তখন রিসার্চ নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। অন্য কোন দিকে নজর দেবার আমার সময় নেই। আমি রত্নার কাছে বসে যন্ত্রের মত অঙ্ক কষে যাই, থিওরেম আর প্রবলেম বোঝাই। চোখ শুধু ক্যাল-কুলাস আর এ্যালজেব্রার দিকে। রত্নার দিকে ছিল না মোটেই। একটু রত্নার দিকে তখন মন দিলে হয়ত ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াত।

রত্না কিন্তু আমার দিকে মন দিতে শুরু করেছিল। আমি অতটা বুঝতে পারিনি। মেয়েদের মনের খবর নেবার অবসর আমার তখনও হয় নি। কিন্তু রত্না বিংশ শতাব্দীর মেয়ে, আমি বুঝতে পারি নি তা বিশ্বাস করবে কেন? ভাবল পি. এচডির জন্য লেখাপড়া করছি—একটা বি. এসসি. পড়ছে মেয়েকে আমার চোখে লাগছে না। অহং-কারে আমি অন্ধ, তাই তাকে অবহেলা করছি।

সুতরাং রত্নাই বা ছাড়বে কেন? প্রেমে বাধা পড়লেই সেটা হিংসার রূপ নেয়। সুতরাং কদিন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যর্থ চেষ্টার পর রত্নাও প্রতিশোধ নিতে শুরু করল। কোনো মেয়েকে কোনো দিন প্রাইভেটে পড়িয়েছেন? পড়ান নি? তাহলে বুঝবেন না। মাষ্টারকে ডাউন করার কত রকমের ফন্দী ওরা জানে। প্রথমতঃ একটা অঙ্কের মাথার সঙ্গে আর একটার লেজ লাগিয়ে একটা অঙ্ক বানিয়ে করতে দেবে। নির্ঘাৎ উত্তর মিলবে না—তখন বাঁকা হাসি হাসবে। মশাই, আমি ব্রহ্মা ত' আর নই যে সব সময় সমস্ত অঙ্ক

করতে পারবো। প্রায়ই সলিড জিওমেট্রির অঙ্ক আটকাতে লাগল। আর রত্নার বাঁকা হাসির মাত্রা বাড়তে লাগল। আচ্ছা, রত্নাকে পড়িয়ে আমার কি লাভ? ডাঃ মুখার্জীকে একটু তেল দেওয়া ছাড়া এর আর কোনো সার্থকতা নেই। কিন্তু এ ভাবে রত্নার ব্যবহার বেশীদিন সহ্য করা সম্ভব হল না। একদিন এই রকম একটা ব্যাপার হবার পরে আমি বল্লাম, 'আমি এসব পারব না।'

ব্যস্। রত্না অমনি ডাঃ মুখার্জীকে রিপোর্ট করে দিলে যে আমি বলেছি পারব না। তিনিও সেটা শুনে রাখলেন—আমাকে কিছু বললেন না।

তারপর মশাই যখনই আমি ডাঃ মুখার্জীর কাছে যাই—তিনি আমাকে ভাগিয়ে দেন। বলেন 'পরে এসো, এখন নয়' 'এখন ব্যস্ত আছি,' 'নিজেই চেষ্টা কর, সবই যদি আমি করি তাহলে ডিগ্রিটা আমারই পাওয়া উচিত'—ইত্যাদি। এদিকে আমার রিসার্চ এগুচ্ছে না—তখন প্রায় সবই শেষ করে এনেছি—সামান্য একটু বাকী, গাইড্যান্স খুবই দরকার। কি করব কিছু বুঝতে পারছি না।

একদিন সন্ধ্যেবেলা ডাঃ মুখার্জীর বাড়ী গেলাম। রত্না দরজা খুলে বল্লে, 'বাবা বাড়ী নেই।'

বল্লাম, "বেশ ত'। আমি অপেক্ষা করব।"

সেদিন খুবই জরুরী দরকার। রিসার্চের দরকার ত' বটেই—তাছাড়া আমার স্কলারশিপ ফরমে তাঁর সই চাই। নইলে টাকা পাব না। তখন কিছু টাকার দরকার।

"বেশ, বসুন তাহলে।" বলে রত্না ওপরে চলে গেল।

চুপচাপ মিনিট দশেক বসে থাকলাম। খবরের কাগজটা তুলেছি, হঠাৎ রত্নার চীৎকার শুনলাম, "রঞ্জনদা, রঞ্জনদা—শীগ্‌গীর আসুন।"

মনে হ'ল রত্না কোনো বিপদে পড়ে ডাকছে। দৌড়ে ওপরে গেলাম। রত্নার ঘরে কোনো আলো নেই—বারান্দার আলোতে

দেখলাম রত্না মেজেতে উপুড় হ'য়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিলাম। বল্লাম, "কি হ'য়েছে ?"

আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না—তখন আমার চব্বিশ বছর বয়স। কিন্তু কখনও কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিই নি। ওর গায়ে হাত দেবা মাত্র সারা শরীরে আমার বৈদ্যুতিক শক্-এর মত অনুভূতি হ'ল। হঠাৎ ঘরের আলো জ্বলে উঠলো। রত্না তড়াক্ করে উঠে দাঁড়াল। ফিরে দেখি দরজায় দাঁড়িয়ে ডাঃ মুখার্জী।

আশা করি, আর না বল্লেও চলবে যে, সেদিন রত্নার বাবা আর কাকার হাতে আমার ভাগ্যে উত্তম মধ্যম জুটেছিল। তবে খুব বেশী কাহিল হইনি। মাত্র দিন চারেক জ্বর হয়েছিল।

ভাল হয়ে আবার গেলাম নিজের ল্যাবোরেটরীতে। সেখানে দেখি ডাঃ মুখার্জী বসে। তিনি জানালেন যে, আমাকে গাইড করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং আমি যেন ডিপারটমেনট ত্যাগ করি।

আমি বল্লাম, "তা সম্ভব নয়। আপনি আমাকে আর কারও কাছে না হয় ট্রানসফার করে দিন্। আমার থিসিস্ প্রায় শেষ, এখন রিসার্চ ছাড়া সম্ভবপর নয়।"

"আমি তোমাকে আর গাইড্ করতে পারব না। তুমি চেষ্টা করে দেখতে পার—যদি অন্য কেউ তোমাকে নিতে চান আমার আপত্তি নেই। তুমি যার অধীনে ইচ্ছে কাজ করতে পার।"

"বেশ। আমি কিন্তু নিজের কাজ করে চলবো। আপনি আমাকে গাইড করুন বা না করুন।"

দু'দিন পরে বুঝতে পারলাম তিনি আমার জন্যে কি করেছেন। প্রথমতঃ আমার স্কলারশিপ্টা বন্ধ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি তাঁর সহকর্মী প্রফেসারদের বলে দিয়েছেন যে কেউ যেন আমার রিসার্চে গাইড না করেন।

ফলে, আমি বুঝে গেলাম যে, আমি পি. এচ ডি কোনো দিনই

পাব না। কিন্তু আমি ল্যাবোরেটরী ছেড়ে গেলাম না। তার অন্য কারণ ছিল।

তিন

আপনাকে বলেছিলাম যে, একটা বাঁদরের ওপরে আমি একটা পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। সেটা আমার থিসিসের অঙ্গ নয়—নিজের খেয়াল খুশীমত পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম। যেদিন বুঝলাম আমার থিসিস কোনোদিনই পি. এচডির জন্য আর দাখিল করতে পারব না, সেদিন থেকে আমি পুরোপুরিভাবে বাঁদরটার পেছনে পড়লাম। বাঁদরটার নাম ছিল ঘণ্টু। আমার ওপরে খবরদারি করার কেউ না থাকায় কাজ করার আরও সুবিধে হল।

ডাঃ মুখার্জী আমাকে গাইড করা বন্ধ করলেও আমাকে ল্যাবোরেটরী থেকে তাড়াতে পারেন নি।

শেষকালে একদিন সফলতা পেলাম। কি সফলতা পেলাম সেটা আপনাকে জানানো দরকার।

কোনো টেকনিক্যাল শব্দ ব্যবহার না করে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো জীবের মস্তিষ্কের দু'টো অংশ আছে। একটা অংশ ঐচ্ছিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, অন্য অংশ অনৈচ্ছিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। যে অংশ ঐচ্ছিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে যে ধমনী রক্ত নিয়ে যায়, তাতে একটা বিশেষ ইনজেকশান দিয়ে বাঁদরটার স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে দিলাম। তার আগে অবশ্য অন্য কয়েকটা আরও ইনজেকশান দিতে হয়েছে যাতে ওর রক্তে কয়েকটা কেমিক্যাল্‌সের আধিক্য হয়।

তারপর ওর মাথার একটা ছোট টুপী পরাতাম। টুপীটা একটা সাধারণ রেডিও রিসিভারের মত। ওতে একটা বিশেষ ট্রান্সফর্মার লাগান থাকত—বেতারের সাহায্যে যখন যে আদেশ পেত সেটা ওর মস্তিষ্কে একটা বৈদ্যুতিক শক্ দিয়ে জানাত। ভিন্ন ভিন্ন আদেশের

জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের বৈদ্যুতিক শক্-এর দরকার হ'ত। সেজন্য বাঁদরটাকে অনেকদিন ট্রেনিং দিতে হয়েছে।

আমি আমার রেডিও ট্রান্সমিটার থেকে আদেশ দিতাম—যে আদেশ দিতাম বাঁদরটা তাই-ই করত।

কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখতাম, ঘণ্টুকে দিয়ে কোনো কাজ করানর পরে ঘণ্টু খুব ক্লান্ত হ'য়ে পড়ত। আর ওর তখন ভীষণ খাই খাই স্বভাব হ'য়ে গেছল। কিন্তু এর সঙ্গে আমার রিসার্চ-এর কোনো সম্বন্ধ আছে বলে জানতাম না। অনেক পরে জানলাম।

এই সময়ে আমার ভীষণ অর্থাভাব দেখা দিল। কারণ সেই স্কলারশিপ বন্ধ। নিজের মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে ডাঃ মুখার্জী আমাকে শাস্তি দেবার জন্য ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করেন নি। নিজেই আমাকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কিন্তু টাকা আমি কোথায় পাই? ব্যাঙ্কের টাকা সব শেষ। মামার কাছে চাওয়া যায় না—নিশ্চয়ই দেবে না। কি করি?

এ সময়ে আমি হোস্টেল ছেড়ে বস্তীতে থাকতে শুরু করেছিলাম। রোজ দেখতাম, সন্ধ্যেবেলা এক মাড়োয়ারীর দোকানে ক্যাশ্ গোনা হয়। সাধারণতঃ মাড়োয়ারী আর ওর এক সাকরেদ দোকানে থাকে। দোকানটা রেশম আর জরীর। তাঁতীরা কেনে সিল্কের শাড়ী বোনার জন্য। বস্তীটা তাঁতীতেই ভর্তি প্রায়। দোকানটা গলির মোড়ে। সন্ধ্যের পরে প্রায় নির্জন হয়ে যায় গলিটা।

রোজ দেখতাম গাদা গাদা টাকা গোনা হচ্ছে। এ দিকে আমার পকেটে কয়েকটা মাত্র পয়সা পড়ে আছে! সুতরাং একটা প্ল্যান করলাম।

আমার সেই রেডিও ওয়েভ কণ্ট্রোল যন্ত্রটাকে একদিন নিজের বস্তীর ঘরে নিয়ে এলাম। এটা একটা ছোট ট্রানজিষ্টার রেডিওর মত। সহজেই বয়ে আনা যায়। পরের দিন বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম ঘরে। অবশ্য লুকিয়ে আনলাম, যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে।

সন্ধ্যের পরে মাড়োয়ারীটা যখন টাকার থলিটা বেঁধে সবে গদী থেকে উঠছে, তখন হঠাৎ ঘণ্টু দোকানে ঢুকে থলিটা নিয়ে চম্পট দিলে। ঘণ্টুকে সোজা সামনের বটগাছে তুলে দিলাম সিগন্যাল দিয়ে। তারপর ঘণ্টু লাফিয়ে লাফিয়ে এবাড়ীর ছাদ থেকে ওবাড়ীর ছাদ দিয়ে সোজা কলেজ ল্যাবোরেটরীর ছাদে হাজির হল। সবই অবশ্য আমার সিগন্যালেই হল।

মাড়োয়ারী কিন্তু চীৎকার করে লোক জড়ো করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। টর্চ আর লাঠি নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু হল বাঁদরটার। টুপী পরা বাঁদর—কাজেই এটা কারুর চালাকী তা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ঘণ্টুকে ওরা খুঁজে পেলো না।

আমার আস্তানা থেকে কলেজ ল্যাবোরেটরী প্রায় মাইল দু'য়েক।

কলেজের ল্যাবোরেটরীর ছাদে যখন পৌঁছালাম, তখন প্রায় রাত দশটা। কিন্তু ছাদের ওপরে ঘণ্টুকে দেখতে পেলাম না।

এবারে ব্যাপারটা চিন্তার হল। আমার সিগন্যালে কোনো ভুল চুক হবার সম্ভাবনা নেই। ঘণ্টু কোন্ রাস্তা দিয়ে এই ছাদে আসবে তার চার্ট আমি আগেই করে রেখেছি। নিয়ম মত ঘণ্টু ছাদের ঠিক মাঝখানে শুয়ে থাকবে। আর তার হাতে থাকবে টাকার থলি। এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করে হয়রান হ'য়ে গেলাম কিন্তু ঘণ্টু কোথাও নেই।

শেষকালে ভাবলাম, চলেই যাই। ল্যাবোরেটরীতে কেউ নেই। শুধু নিজের কাজের জায়গাটা খুলে রেখে ওপরে উঠেছি। কোনো দারোয়ান বা চাপরাশি যদি আমাকে এভাবে রাত-দুপুরে ছাদে ঘুরতে দেখে তাহলে সন্দেহ করতে পারে। তার ওপরে ভীষণ শীত।

নীচে যাব বলে ফিরে আসছি, হঠাৎ নজর পড়ল সিঁড়ির কাছে কি একটা পড়ে আছে। তুলে দেখি সেই টাকার থলি।

ল্যাবোরেটরীতে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। থলি খুলে টাকা গুণলাম। খুব বেশী নয়। মাত্র বারশ' টাকা। অবশ্য আমার পক্ষে এই-ই অনেক।

টাকাগুলো পকেট ভরলাম। থলিটা পুড়িয়ে ফেললাম।

তা না হয় হল, কিন্তু ঘণ্টু কোথায় গেল? ওকে খোঁজা দরকার। কেননা ঘণ্টু ধরা পড়লে আমার ধরা পড়তে খুব বেশী দেরী হবে না।

সুতরাং আর একবার ছাদে উঠে খুঁজতে হ'ল। কোনো ফল হ'ল না। হঠাৎ মনে হ'ল ঘণ্টু তার আস্তানায় ফিরে গিয়ে থাকতে পারে। গেলাম জানোয়ার রাখার জায়গায়। কিন্তু ঘণ্টুকে সেখানেও খুঁজে পেলাম না।

চার

অগত্যা বাড়ী ফিরতে হল। রেডিও ওয়েভ কনট্রোল যন্ত্র দিয়ে এখন ঘণ্টুকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। কেন না ঘণ্টুকে যে ইনজেকশান দিয়েছিলাম তার প্রভাব শেষ হয়ে গেছে। চার ঘণ্টার বেশী প্রভাব থাকে না। সুতরাং কলকাতা থেকে পালানই ভাল। কেন না ঘণ্টু ধরাপড়া মাত্র পুলিশ আমাকেও ধরে হাজতে পুরবে। ভোরের ট্রেণে বম্বে পালাব ঠিক করলাম।

ভোর বেলা হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলাম। নাগপুর এক্সপ্রেস ছাড়বে ৭-১৫ মিনিটে। একটা বম্বের টিকিট কিনে গাড়ীতে বসলাম। সারারাত ঘুমুই নি। দুশ্চিন্তার চোটে আরও কিছুদিন ঘুম হবে না।

একটা বিষয়ে অবশ্য আমি নিশ্চিন্ত। ঘণ্টু ধরা পড়লেও ওটা যে আমার বাঁদর তা কেউ বলতে পারবে না। ওটার ওপরে আমি একসপেরিমেণ্ট চালিয়েছি তা অনেকেই অবশ্য জানে। তাছাড়া এখন কলকাতায় থাকলেই আমাকে ল্যাবোরেটরীতে যেতে হবে। পুলিশ যদি ঘণ্টুকে নিয়ে একবার কলেজে যায় তাহলে ঘণ্টুই আমাকে

সনাক্ত করে ফেলবে। তখন আমার আস্তানায় হানা দিলেই পুলিশ বামাল সমেত আমাকে ধরে ফেলবে। সুতরাং আপাতত পালানই ভাল।

একটা থার্ডক্লাশ গাড়ীর বাঙ্কে বিছানা পেয়ে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম প্লাটফর্মে খবরের কাগজওয়ালা চীৎকার করছে—"রহস্যময় চুরি, চোর-বাঁদরের কীর্তি পড়ুন।" "তাজা খবর! খুনী বাঁদরের কাহিনী।"

শুনে চমকে উঠলাম। ভাবলান, ঘণ্টুই খুন করল নাকি?

কাগজওয়ালাকে ডাকলাম। কাগজটা হাতে নিয়েই চমকে উঠলাম—প্রথম পৃষ্ঠায় ঘণ্টুর একটা ছবি।

ঘণ্টুর মাথায় আমার তৈরী যান্ত্রিক টুপীটা ছিল না। অর্থাৎ ধরা পড়ার আগে হয় ও টুপিটাকে খুলে রেখেছিল না হয় পুলিশ খুলে ফেলেছে। পুলিশ যদি টুপিটাকে পেয়ে থাকে তাহলে মুস্কিল। ওর যন্ত্রপাতি প্রায় সবই কলেজের হবি ওয়ার্কশপে তৈরী। যারা তৈরী করেছে তারা ঠিকই চিনতে পারবে। সুতরাং আমি ধরা পড়ে যাব।

খবরের কাগজের কাটিংটা আমার কাছে আছে। পড়ছি শুনুন—

"বিশ্বাস করুন বা না করুন।

খবর পাওয়া গিয়াছে যে, কলিকাতার একটি বস্তী এলাকায় গতরাত্রি প্রায় ৭টার সময় একজন জরী ও রেশম ব্যবসায়ীর দোকান হইতে প্রায় বারশত টাকা চুরি যায়। চোর একটি বাঁদর। বাঁদরের মাথায় একটি কাল রং-এর টুপী পরান ছিল। সেজন্য সকলে সন্দেহ করিতেছে যে, ইহা কোনও দুষ্ট লোকের কারসাজী। অনেক খোঁজা-খুঁজি করিয়াও বাঁদরটির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

কলেজ ষ্ট্রীট হইতে আরও একটি অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে সেখানে একটি গৃহস্থ বাড়ীতে একটা বাঁদর রান্না ঘরে ঢুকিয়া পড়ে

এবং সমস্ত খাবার গোগ্রাসে খাইতে শুরু করে। তখন প্রায় নয়টা। ঐ বাড়ীর একটি মেয়ে (২২ বৎসর) বাঁদরটিকে দেখিতে পায়। সে একটা লাঠি লইয়া বাঁদরটিকে তাড়া করিলে বাঁদরটি হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার গলার কাছে কামড়াইয়া ধরে। মেয়েটির চীৎকারে অনেকে আসিয়া পড়ে। তখন বাঁদরটি মেয়েটিকে ছাড়িয়া পালাইয়া যায়।

মেয়েটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। রাত্রি প্রায় বারটার সময় মেয়েটির মৃত্যু হয়।

পাড়ার লোকেরা বাঁদরটির গতিবিধির উপরে দৃষ্টি রাখে। রাত্রি প্রায় ছয়টার সময় দমকল বাহিনী বাঁদরটিকে গ্রেফতার করিতে সমর্থ হয়।"

তার মানে ঘণ্টু এখন দুটি অপরাধে অপরাধী। প্রথমটি চুরি আর দ্বিতীয়টি খুন। ঘণ্টুকে যদি কেউ সনাক্ত করতে পারে তাহলেই পুলিশ আমার খোঁজে বেরুবে।

সুতরাং আমি বম্বে পালালাম।

এই আমার প্রথম খুন।

পাঁচ

সিটিতে না থেকে আমি শহরতলীর দিকে বাসা নিলাম। বাসা মানে একটা শুধু ঘর। একটা কুয়ো আছে, সেখান থেকে জল এনে স্নান করা আর পান করা। আর একটা চাকরিও পেলাম। এতদিন রেডিও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে এসেছি, আমার কাজ দেখে আমাকে একটা রেডিও কারখানায় নিয়ে নিল। মাইনে প্রায় আড়াইশো সব মিলিয়ে। নাম আর ডিগ্রি সব চেপে দিলাম। নাম বল্লাম রাকেশ লাহিড়ী।

দিব্যি কাটতে লাগল। সেই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ হ'ল হামিদুল্লা শা'র সঙ্গে।

হামিদুল্লা শাঁ নিজেকে লক্ষ্ণৌ-এর নবাব বংশের লোক বলে পরিচয় দিল। সে থাকে আমার বাড়ীর কাছেই। ওর রাজকীয় পরিচয়ের সাক্ষী ওর প্রিভি পার্শ অর্থাৎ বার্ষিক সাড়ে ছ'শ টাকা। এ ছাড়া অন্য কোনো আয়ও নেই। সারা বছর ধার করে আর ওর টাকা এলেই দিয়ে দেবে বলে। ওর সম্পত্তি শুধু একটা কুকুর আর একটা ঘোড়া। আর একটা সহিস চাকর আছে।

পাড়ার লোকের কাছে শুনলাম যে, হামিদুল্লার সব সম্পত্তি ঘোড়ার রেসের পেছনে গেছে। সে কয়েকবার অষ্ট্রেলিয়া থেকে ঘোড়া আনিয়েছিল, কিন্তু ওর ঘোড়া কখনই জেতে নি। ওর বাড়ীতে যে ঘোড়াটা আছে, সেটাও রেসের ঘোড়া।

আলাপ হওয়া মাত্র হামিদুল্লা আমার কাছ থেকে টাকা ধার করতে শুরু করল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, ওর জানা শোনা কেউ ওকে আর ধার দেয় না। তবে কখনই দশ-পাঁচ টাকার বেশী চাইত না। হিসেব করে দেখেছিলাম কোনো মাসে টাকা পঁচিশের বেশী নিত না। সুতরাং নবাব বন্ধু রাখার পক্ষে খরচটা খুব বেশী নয়। দিয়ে দিতাম। টাকা শুধু শনিবারে চাইত রেস খেলার জন্য। অবশ্য পাঁচ টাকায় কী যে রেস খেলত, বুঝতে পারতাম না।

পরে শুনেছিলাম যে, হামিদুল্লা আন্‌অফিসিয়ল বাজী ধরে। যে কোনো রেসের মাঠেই এটা হয়। মাঠের বাইরে অনেক এজেণ্ট থাকে। তারা ঘোড়ার নামে টাকা জমা নেয়। ঘোড়া জিতলে সেই অনুপাতে টাকা দিয়ে দেয়। ঘোড়া হারলে টাকা গেল। হামিদুল্লা যখন জিতত তখন গান গাইতে গাইতে ফিরত। বুঝতে পারতাম ওর পেটে খানেকটা ধান্যেশ্বরী ঢুকেছে। যখন হারত, তখন চুপচাপ নিজের ঘরে ফিরে যেত।

বেশী জিতলে আবার ধারের টাকা ফেরৎ দিয়েও যেত।—"বাঙালীবাবু, রূপিয়া লিজিয়ে" বলে দু' একটা নোট আমার হাতে

দিয়ে যেত।

একদিন সকালে হামিতুল্লা এসে বল্লে, "বাঙালীবাবু, তুমি আমার ঘোড়াটা রেখে আমাকে দু'শো টাকা ধার দেবে?"

বল্লাম, "তুমি টাকা নিয়ে যাও। কিন্তু ঘোড়া নিয়ে আমি কি করব?"

"বেশ দাও।"

হামিতুল্লা টাকা নিয়ে চলে গেল। দু' দিন পরে এসে বল্লে, "আমি লক্ষ্ণৌ যাচ্ছি। তুমি আমার ঘোড়াটাকে রাখ। তোমাকে আর টাকা ফেরৎ দিতে পারব না।"

আমি বল্লাম, "আমি ঘোড়া নিয়ে কি করব? তোমার রেসের ঘোড়ার তোয়াজ করা আমার কর্ম নয়। অত টাকা নেই।"

কিন্তু হামিতুল্লা নাছোড়বান্দা। সে আমাকে ঘোড়াটা গছাবেই। অগত্যা রাজী হলাম। তখন হামিতুল্লা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বল্লে, "ঐ ঘোড়াটার দাম কম করে হলেও ১০ হাজার টাকা। সুতরাং আমি তোমার কাছে আরও ন' হাজার টাকা পাই।"

"তার মানে?"

"আজ পর্যন্ত যত ধার তুমি দিয়েছ সব মিলিয়ে এক হাজারের বেশী নয়। সুদ-সমেত এক হাজারই ধরলাম। সুতরাং আরও ন' হাজার টাকা আমার পাওনা থাকল।"

"আমার অত টাকা নেই। তুমি তোমার ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়।"

"তা হয় না বাঙালীবাবু। একবার যখন কথা দিয়েছ তখন বাকী টাকা দিতেই হবে।"

"আমার অত টাকা নেই। কোথা থেকে দেবো?"

"এখন নেই, পরে হবে। তখন দিও। এই কাগজে আমার যাদের কাছে ধার আছে তাদের নাম ঠিকানা আছে। আস্তে আস্তে

দিয়ে দিও। ওটা হাজার চারেক। বাকী পাঁচ হাজার পরে দিয়ে দিও।"

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হামিদুল্লা চলে গেল।

কাগজগুলো খুলে দেখি পাওনাদারদের একটা লিষ্ট। একটা রেস ক্লাবের মেম্বারশিপের কার্ড, আর একটা সেই ঘোড়ার বংশ-পরিচয়। ঘোড়াটার বাপ, মা, ভাই, ঠাকুর্দা, দিদিমা, কাকা ইত্যাদিদের নাম ধাম আর কে কবে কোন রেস জিতেছে তার ইতিহাস।

পরের দিন ভোরবেলা হামিদুল্লার সহিস রসিদ ঘোড়া সমেত হাজির। বল্লে, তাকে নাকি মালিক সাহেব হুকুম করেছেন ঘোড়াটা আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যেখানে খুশী চলে যেতে।

"হুজুর, আমি গরীর মানুষ। আট বছর বয়স থেকে মালিক ছাড়া কাউকে চিনি না। ওঁর বড় বড় রইসী ঘোড়ার সেবা করেই জীবন কেটেছে। কিন্তু এখন কোথায় যাব?"

বল্লাম, "আমি ঘোড়াটা কোথায় রাখব এখনও ঠিক করতে পারি নি। আপাতত যেখানে ঘোড়াটা ছিল সেখানেই থাক। তুমিই দেখাশোনা কর।"

বলেই বাড়ী থেকে চলে গেলাম। মহা দুশ্চিন্তা। কাজে গেলাম। মন বসছে না। মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।

একটু দেরী করেই বাড়ী ফিরলাম। ফিরে দেখি অনেক লোক আমার ঘরের সামনে জটলা করছে। আমি কাছে আসতে একজন নমস্কার করল। জিগ্যেস করলাম, "কি ব্যাপার?"

তারা যা বল্লে, তার মানে এই দাঁড়াল যে হামিদুল্লা কাল সবাইকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে আমি হামিদুল্লার সমস্ত সম্পত্তির বিনিময়ে তার সমস্ত ধার শোধ করবার দায়িত্ব নিয়েছি। তাদের অনেক টাকা আটকে আছে। সুতরাং আমি যেন মেহেরবানী করে তাদের টাকা

দিয়ে দিই।

শুনে আপাদমস্তক রাগে জ্বলে উঠলো। হামিদুল্লাকে সামনে পেলে হয়ত খুনই করে ফেলতাম। বললাম, "হামিদুল্লা আমার কাছে টাকা ধার করেছিল। সে জন্য তার ঘোড়াটা আমাকে দিয়ে গেছে। তোমাদের টাকা শোধ করার দায়িত্ব আমার নয়। সেটা হামিদুল্লার —তার কাছে যাও।"

সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। আমি সোজা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। বাইরের গোলমাল তাতে বেড়ে গেল।

একটু বাদে মনে হ'ল বাইরের গোলমাল যেন কমে এল। কেউ যেন ওদেরকে কি বোঝাচ্ছে মনে হ'ল। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি সেই সহিসটা লেক্‌চার দিচ্ছে। সরে গেলাম সেখান থেকে।

খানিক পরে দরজায় খুট্‌ খুট্‌ আওয়াজ হ'ল। খুলে দেখি সেই সহিস। বললাম, "কি ব্যাপার?"

সে বললে, "ওরা চলে গেছে হুজুর। আজকে 'বম্বই কুইন' সারা-দিন খায়নি। সেজন্য যে হুকুম করবেন তা করব।"

অর্থাৎ এখন টাকা দাও। "বম্বই কুইনকে" (অর্থাৎ সেই ঘোড়াটাকে) খাওয়াতে হবে। কি আর করি, দু'টো টাকা দিয়ে দিলাম।

রাত্রে ভেবে ঠিক করলাম ঘোড়াটাকে বিক্রী করে দেবো।

পরের দিন রসিদ আসতে বললাম সে কথা। জিগ্যেস করলাম, ওটাকে বেচার কোনো ব্যবস্থা সে করতে পারবে কি না?

রসিদ অবাক হয়ে গেল। বলেল, "হুজুর, রেসের ঘোড়া কেনার মত লোক কংগ্রেসী রাজ্যে কোথায় পাবেন? তবে যদি আপনি বম্বই কুইনকে দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়ী চালাতে চান, তাহলে বিক্রী হবে।"

'রেসের ঘোড়া' কথাটা শোনা মাত্র একটা নতুন আইডিয়া মাথায় এল। সঙ্গে সঙ্গে মন ঠিক করে ফেললাম। আর সেই আইডিয়ার

জোরে মাস তিনেকের মধ্যে কয়েক লাখ টাকা রোজগার করে ফেললাম।

বোধ হয় অনুমান করতে পারছেন। ঘোড়ার লাগাম আর জীনে মিলে আসলে সেই রেডিও ওয়েভ রিসিভারটা লাগান থাকত। হাজার পরীক্ষা করেও বোঝা সম্ভব নয় কারুর পক্ষে। আমি রেস কোর্সে দর্শকদের আসনে বসেই যন্ত্রে নির্দেশ দিতাম। প্রত্যেক বারেই "বম্বই কুইন" ফার্স্ট হ'ত! ব্যস্!

ছয়

আমার জীবন বদলে গেল। রেস খেলার টাকা দিয়ে একটা বাড়ী কিনলাম। কিছু কোম্পানীর কাগজও কিনলাম। আর টাকা ওড়াতে শুরু করলাম।

উড়ো টাকা কখনও থাকে না। সেটা ঠিক নষ্ট হয়ে যায়। আমার বেলাও তাই হ'ল। হামিদুল্লা ফিরে এল। এসে ঘোড়ার বাবদ আমার থেকে বেশ কিছু আদায় করে নিল।

এমন অবস্থায় যা হয়, আমারও তাই হ'ল। খুব বেশী মদ খেতে শুরু করলাম। বম্বেতে অবশ্য সবই কালোবাজারে কিনতে হ'ত।

সে যা' হোক। আমার ব্যবসা কিন্তু বেশী দিন চললো না। হঠাৎ যেমন অনেক টাকা আসতে শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম। বাড়ী ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল অনেক লোকের হৈ হট্টগোলে। ভাল করে ঘুম ভাঙার পর বুঝতে পারলাম যে কে বা কারা আমার দরজায় খুব জোরে জোরে ধাক্কা মারছে। দরজা খুলে দেখি আমার চাকর আর বেশ কয়েকজন পাড়ার লোক।

যা শুনলাম তাতে আমার নেশা কেটে গেল। আমার সহিস (এবং জকি) রসিদকে কে খুন করেছে। তার মৃতদেহ আস্তাবলে

পড়ে আছে। গলার কাছে বিরাট ক্ষত।

পুলিশ এল। বাড়ীর সব চাকর-বাকরদের জবানবন্দী নিয়ে চলে গেল। রসিদের মৃতদেহও নিয়ে গেল।

পুলিশ অবশ্য অনেক রকম জল্পনা করতে শুরু করল। আমাকে অনেক প্রশ্ন করার পরে বিকেল বেলা রেহাই দিল।

বাড়ী ফিরে এলাম। হঠাৎ আস্তাবলে গিয়ে একটা জিনিষ দেখে চমকে উঠলাম। একটা সন্দেহ মনে উঁকি মারল। ভাল করে পরীক্ষা করার পর আর সন্দেহ রইল না। রসিদের হত্যাকারীকে চিনতে পারলাম।

অনুমান করতে পারছেন? পারছেন না? সহিসকে খুন করেছে ঘোড়াটা। ওর গলার লোমে, কষে জমাট বাঁধা রক্ত দেখেই বুঝতে পারলাম।

পরের দিন পুলিশ পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট নিয়ে এল। ঘোড়াটাই সহিসের গলা কামড়ে ধরে খুন করেছে, পুলিশও বললে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কাছে আমাকে মুচলেখা দিতে হ'ল যে আমি ঘোড়াটাকে কখনও বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাব না। ভবিষ্যতে যদি এ রকম ঘটনা আবার হয় তাহলে আমাকেই পুলিশ দায়ী করবে। কেন না, পুলিশের মতে ঘোড়াটা পাগল।

আমার রেস খেলার বারোটা বেজে গেল। তার পরে যাঁরা আমার বাড়ীতে আসতে শুরু করলেন তাঁরা প্রেস-রিপোর্টার।

পরের দিন সমস্ত খবরের কাগজে আমার আর আমার ঘোড়ার ছবি বেরুল। আর রেসের ঘোড়ার সহিস খুন করার রসাল কাহিনী তার সঙ্গে।

এই ঘোড়াটাকে নিয়ে আমি এবারে কি করব? সুতরাং নিজের রিভলভারটা থেকে দু'টো গুলী খরচ করে ওটাকে শেষ করে ফেললাম।

তার পরে পেটের চিন্তা দেখা দিল। আবার সেই পুরোনো

কারখানায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হ'ল না, কি করব ভাবছিলাম। তার ওপরে আর একটা চিন্তা নতুন করে আমার মনে দেখা দিল। ভাগ্য-চক্রের ফেরে আমার অজ্ঞাতবাস শেষ হয়ে গেল, সমস্ত কাগজে আমার ছবি ছাপা হবার পর। যদি ঘণ্টুর কেসে পুলিশ আমাকে সন্দেহ করে থাকে তাহলে দু' একদিনের মধ্যেই ক্যালকাটা পুলিশ আমাকে পাকড়াও করবে।

কিন্তু কলকাতা থেকে পালান যত সোজা ছিল, বম্বে থেকে পালান তত সোজা নয়। বম্বেতে আমার নামে একটা বাড়ী আছে, বেশ কিছু শেয়ার আছে। এগুলো অবশ্য আমার আসল নামেই কেনা, অর্থাৎ রঞ্জন লাহিড়ীর নামে। ছদ্মনামে নয়। সব ফেলে কোথায় যাব? পুলিশ ধরে ত' ধরুক!

কিন্তু চারদিন হ'য়ে গেল, পুলিশ এল না। তার জায়গায় এল একটা চিঠি। যে চিঠি পাবার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি কখনও। চিঠিটা কার কাছ থেকে এসেছিল অনুমান করতে পারেন? এসেছিল রত্নার কাছ থেকে।

চিঠিটা এতবার পড়েছি যে একেবারে মুখস্থ হ'য়ে গেছে। শুনুন—

রঞ্জনদা,

তোমাকে অনেকদিন আগে থেকেই চিঠি লিখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোনো সুযোগ ছিল না। তুমি আমার অমানুষিক ব্যবহারের জন্য দেশত্যাগী হয়েছ তা আমি জানি, কিন্তু তুমি পেছনে একটাও চিহ্ন রেখে গেলে না কেন? এমন কি নামও বদলে ফেললে? তুমি রঞ্জন থেকে যে রাকেশ হ'য়ে উঠবে তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।

সে যা হ'ক। আমি তোমার কাছে অনেক অপরাধ করেছি। নিজের অপরাধ স্খালন করার চেষ্টা আমি করব না, কিন্তু সত্য কথা তোমার জানা উচিত, তাই এ চিঠি লিখছি।

তোমাকে আমি সত্যই ভাল বেসেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম তুমিও আমাকে ভালবাসবে। কিন্তু তা তোমার কাছ থেকে আমি পেলাম না।

পলাম শুধু মাস্টারীর উপদেশ আর অবহেলা। কাজেই আমি আঘাত দিয়ে তোমাকে জাগাতে চাইলাম।

কিন্তু আমার ভাগ্য মন্দ, আমার প্ল্যান ফেল করল। হঠাৎ বাবা এসে গেলেন, আমাকে ঐ অবস্থায় দেখার পর ওঁর ধারণা হ'ল অন্য রকম। বাবা তোমাকে এত শাস্তি দেবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আরও একটা কথা তোমাকে জানাচ্ছি, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না—তুমি কলকাতা ত্যাগ করার পর আমি সব কথা জানতে পেরেছিলাম। তোমার স্কলারশিপ বন্ধ হবার খবর আমি জানতাম না, জানলে হয়ত কিছু করতে পারতাম।

মা আমার সব কথাই জানতেন। আমি বি, এস. সি. পাশ করার পর আর পড়ি নি, চাকরি নিয়ে এসেছি একটা ফার্মে। আমি বাড়ী ছাড়ার আগে আমার সঙ্গে বাবার একটু মনোমালিন্য হ'য়ে গেছে তোমাকে নিয়ে।

খবরের কাগজে তোমার যে ছবি আর কাহিনী বেরিয়েছে তার সঙ্গে আমার জানা রিসার্চ-স্কলারের কোনো সাদৃশ্য নেই। তুমি আমাকে কোনোদিন ভাল বাসনি—এখন হয়ত ঘৃণা কর। আমি কিন্তু ঐ রেস্থড়ে রাকেশকে ভালবাসি নি। ভালবেসেছিলাম রঞ্জনকে। তুমি যদি আবার সেই রঞ্জন হ'য়ে কখন ফিরে আসতে পার তাহলে আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো। শুধু তোমার সঙ্গে একবার দেখা করার জন্যই আমি এখনও কলকাতায় আছি। তারপরে অন্য কোথাও চলে যাব।

অনেক আবোল-তাবোল লিখলাম। চিঠিটা তুমি আদৌ পড়বে কি না জানি না। আমার সব কথা লিখলাম। ভালোবাসা রইল। ইতি—

তোমার—রত্না।

সাত

চিঠির উত্তর আমি দিয়েছিলাম। রত্নাকে আমি বুঝতে পারলাম। রত্না চেয়েছিল শুধু একটু ভালবাসা, আর কিছু নয়। রত্নাকে লিখলাম যে, আমার রেস্থড়ে জীবন শেষ হয়ে গেছে। আমাকে নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে।

সত্যই আর রেস খেলা সম্ভবপর ছিল না কেননা আবার একটা রেসের ঘোড়া কোথায় পাব? যদিও বেশ কয়েকজন ঘোড়া বিক্রী করতে চেয়েছিল, কিন্তু যে দাম তারা হাঁকল তা দিতে হলে আমাকে বাড়ী বিক্রী করতে হয়। ইতিমধ্যে হামিদুল্লাও পটল তুলেছে। অবশ্য বেঁচে থাকলেও আর একটা রেসের ঘোড়া কোথায় পেত?

রত্নার সঙ্গে তিন চারটে চিঠি বিনিময়ের পর কলকাতায় এলাম। একটা কলেজে চাকরি পেলাম। আর রত্নাকে বিয়েও করলাম কয়েক দিনের মধ্যেই।

ডাঃ মুখার্জী এবার আমার থিসিসটা ফরওয়ার্ড করে দিলেন। যথাসময়ে পি. এচ. ডিও পেলাম।

আমার জীবন সুখেই কাটতে লাগল। রত্নার রূপ আর গুণ দুটোই ছিল। যথেষ্ট সেবা আর ভালবাসা দিয়ে রত্না আমার জীবনটাকে ভরে তুললো।

হঠাৎ একদিন কাগজে পড়লাম রাশিয়া আর আমেরিকার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হ'য়েছে আমার থিসিসের বিষয়টা নিয়ে। ওরা চেষ্টা করছে কি ভাবে মানুষের সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তাশক্তিকে নষ্ট করে দিয়ে তাকে যান্ত্রিক উপায়ে চালনা করা সম্ভব?

যে রিসার্চটাকে আমি ছেড়ে রেখেছিলাম, সেটা যে এমন ভাবে আবার উঠে পড়বে তা আমি ভাবি নি। এর আমি সবই জানি। এখুনি কোনো জার্ণালে ওটা প্রকাশ করলেই আমি অমর হ'য়ে যাই। কিন্তু হাতেনাতে করে দেখানোর প্রমাণ কি করে দিই? তা ছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিক সত্যই প্রমাণিত করা যাবে না। যে বাঁদর আর ঘোড়াকে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম, দু'জনকেই বেআইনী কাজে ব্যবহার করেছি। প্রকাশ করলেই জেলে নিয়ে যাবে। বাঁদরটা ত' সোজা চুরির জন্য ব্যবহার করেছি। আর রেস্ কোর্সে আমার ঘোড়াটা তো বে-আইনী ভাবে জিতেছে। আমার ঘোড়াটা তো আর নিজের শক্তিতে ছোটে নি, ছুটেছে বৈদ্যুতিক শকে। সেসব তথ্য

প্রকাশ করলেই সোজা হাজতবাস করতে হবে।

কিন্তু এখন আমি কি করি? আমার আবিষ্কৃত জিনিষ অন্যে আবার বের করে ফেল্লেই আমার কোনো মর্যাদা থাকবে না। কাজেই কোনো একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করে ফেলতে হবে। আমার রিসার্চটাকে কোথাও প্রকাশ করতেই হবে।

কিন্তু এখন কার ওপরে আমি পরীক্ষা চালাব? কে রাজী হবে এই মারাত্মক পরীক্ষায় যোগ দিতে?

আমার চিন্তিত মুখ রত্নার চোখ এড়াল না। জিগ্যেস করল, "তোমাকে কদিন থেকে খুব চিন্তা করতে দেখছি। কি হয়েছে?"

"কিছু হয় নি।"

"এত তবে কি ভাবো?"

"ও কিছু নয়।"

তখন ত' এড়িয়ে গেলাম। কিন্তু স্ত্রীর কাছে কি করে লুকিয়ে রাখা সম্ভব? সব কথা একদিন বল্লাম। নিজের বাঁদর আর ঘোড়ার কাহিনীও বল্লাম। শেষে জানালাম যে, রাশিয়া আর আমেরিকার অনেক বৈজ্ঞানিক একযোগে কাজ করছে। কোন্‌দিন ওরা আবিষ্কার করে ফেলবে ব্যাপারটা। আমার রিসার্চটা মাঠে মারা যাবে।

শুনে রত্না হাসল। বললে, "এর জন্য এত ভাবনা কি? আমি ত' আছি।"

"তুমি আছ মানে?"

"আমাকে তোমার প্রমাণের উপকরণ বানাও। আমার ওপরে তুমি একসপেরিমেনট কর।"

শুনে আমি থ' হয়ে গেলাম। বললম, "রত্না, তুমি পাগল হ'য়ে গেছ। অসম্ভব। আমার পক্ষে তোমার ওপরে পরীক্ষা চালান সম্ভব নয়।"

কিন্তু রত্না নাছোড়। সে আমার পরীক্ষায় যোগ দেবেই। অনেক বোঝালাম। কিন্তু কিছুতেই রত্নাকে নিরস্ত করতে পারলাম

না। রত্নার কাছে শেষে হার মানলাম। শেষকালে রাজী হ'তে হ'ল।

আট

ফেল্। ফেল্ করলাম আমি।

প্রথম দিন রত্নাকে ইন্‌জেকশন দেবামাত্র ওর শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হ'ল।

এটা আমি জানতাম না। এর আগে ইন্‌জেকশন্ দিতাম পশুদের। তারা ত' আর বলতে পারত না যে, কি হচ্ছে। যে কোনো ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়ার মতই এর প্রতিক্রিয়া হবে, এটাই জানতাম। কোনো পশুর বেলাই ইনজেকশনের ফল চার ঘণ্টার বেশী থাক না, এটাই জানতাম। কিন্তু রত্নার বেলা তা হ'ল না। প্রথমে রত্নার মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হল। যন্ত্রণায় রত্না কাঁদতে লাগল। কিন্তু আমার করার কিছুই ছিল না। কিন্তু এ দৃশ্য সহ্য করাও যায় না। তাড়াতাড়ি ইথার দিলাম। রত্না অজ্ঞান হয়ে গেল। তথাপি একটা যন্ত্রণা কাতর স্বর ওর মুখ থেকে বেরুতে লাগল। বুঝলাম, অজ্ঞান অবস্থাতেও ওকে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। আমি ধরে নিলাম যে, প্রথম দিন রত্নার ও যন্ত্রণা হবে, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু তা হ'ল না। ইথারের প্রভাব কাটতে লেগে গেল প্রায় সাত ঘণ্টা। তারপরেও কিন্তু সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারল না।

রত্না বল্লে, ভীষণ ক্লান্ত লাগছে, সারা গায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে।

এ সব জানা ছিল না। এর প্রতিকারও জানি না। সুতরাং ভাবলাম বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। ভাল করে খাইয়ে শুইয়ে দিলাম। ১২ ঘণ্টা ঘুমোবার পরে রত্না স্বাভাবিক হয়ে উঠলো।

ভাবলাম, যাক্, প্রথম ধাক্কা কাটলো। কিন্তু তখনও জানতাম

না যে, আমি কি করে ফেলেছি।

জানলাম দু'দিন পরে। ভেবেছিলাম, সেদিন রাত্রে রত্নাকে নিয়ে আবার পরীক্ষা করব। সেজন্য রেডিও ওয়েভ কনট্রোল যন্ত্রটা নিয়ে পরীক্ষা করে ঠিক করে রেখে বাড়ী গেলাম।

আমাদের বাড়ীর ঝি (রাণীর মা)-এর মুখে একটা কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। সে জানাল যে, রত্না আজকে অনেকটা কাঁচা মাংস খেয়ে ফেলেছে।

"কি ব্যাপার?" জিগ্যেস করলাম। সে জানাল যে, আজকে মাংসওয়ালা দেরী করে মাংস দিয়ে গেছল। সেজন্য রত্না মাংস ফ্রিজে রেখে দিতে বলে। বাড়ীর অন্যান্য কাজ সেরে, কি একটা জিনিস আনতে সে খাওয়ার ঘরে যায়। সেখানে দেখে রত্না ফ্রিজ খুলে কাঁচা মাংস খাচ্ছে।

ব্যাপার দেখে রাণীর মা একটু ভয় পায়। রত্না কিছু টের পাবার আগেই সে চলে এসেছিল। কিন্তু পরে সে মাংসটা বের করে দেখে যে রত্না প্রায় একপোয়া মাংস খেয়ে ফেলেছে।

শুনে একটু আশ্চর্য লাগলেও, খুব অস্বাভাবিক মনে হল না। ঐ ইনজেকশনের জন্য খুব খিদে পায় এবং যা সামনে পাবে তাই সে খাবে, সেটা ত' স্বাভাবিক। কিন্তু রত্নার পক্ষে কাঁচা মাংস খাওয়াটা আশ্চর্যের, কেননা সে মাংস প্রায় খায়ই না।

ব্যাপারটা চাপা দেওয়া দরকার। তাই বল্লাম, "তোমার বৌদির বাচ্চা হবে রানীর মা, ওর ওপরে একটু নজর রেখো। কদিন থেকে যা তা খেতে শুরু করেছে।"

"তাই বল, দাদাবাবু। নইলে বৌদি অমন কাণ্ডটা করবে কেন? মিষ্টি খাওয়াও দাদাবাবু, এমন একটা সুখবর শোনালে।"

ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন তখন মনে হয় নি। কাজেই রত্নাকে নিয়ে সিনেমা গেলাম। ফিরে এসে একসপেরিমেনট শুরু করলাম।

এবার ইনজেকশন দেবার পর রত্না কোনো অসুবিধের কথা বলল না। রত্নার মাথায় সেই রেডিও ওয়েভ রিসিভারটা পরালাম। এটার যান্ত্রিক জটিলতা আগেকারগুলোর তুলনায় অনেক বেশী।

কিন্তু আমার রেডিও সিগন্যালসের কোনো ফল হল না। আমি অনেক রকমভাবে চেষ্টা করলাম, কিন্তু রত্নার দেহে সামান্যতম স্পন্দনও জাগাতে সক্ষম হলাম না। আমি ফেল্ করলাম।

নয়

রত্না যাতে আবার কোনো গণ্ডগোল না করে, সেজন্য একটা মর্ফিয়া ইনজেকশন দিয়ে দিলাম। তার পরে আবার নিজের ল্যাবো-রেটরীতে ফিরে গেলাম।

পুরো চারদিন কাজ করার পর ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। জন্তু-জানোয়ারকে চালাবার জন্য যে রেডিও ওয়েভ দরকার, মানুষকে চালাবার জন্য তার চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ওয়েভ চাই।

এই সামান্য ব্যাপারটা আমার মাথায় এতদিন আসে নি। যখন ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল, আমিও আর্কিমিডিসের মত "ইউরেকা" বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

রাত তখন দু'টো। এ চারদিন বাড়ী যাই নি, ল্যাবোরেট-রীতেই ছিলাম। সুতরাং বাড়ী চলে এলাম।

দরজার কলিং বেল টিপলাম। প্রায় কুড়ি মিনিট পরে দরজা খুললো রত্না।

বল্লাম, "এত দেরী হল কেন? ঘুমুচ্ছিলে?"

"হ্যাঁ।"

—"ঝি, চাকর সব কোথায়?"

—"দু'জনেই ছুটিতে গেছে।"

—"ওঃ।"

গিয়ে শুয়ে পড়লাম। এত রাত্রে আর স্ত্রীর সঙ্গে আবিষ্কার

নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে হ'ল না। ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঠিক কেন জানি না, ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। দেখলাম, রত্না ঘরে নেই। আমাদের শোবার ঘর একটাই, কিন্তু দু'টো আলাদা বিছানা। একা না শুলে রত্নার ঘুম আসে না। সেজন্য এই ব্যবস্থা বরাবর।

প্রথমে ভাবলাম রত্না বাথরুমে, কিন্তু সেখানে ত' আলো নেই। সুতরাং রত্না নিশ্চয়ই বাইরে গেছে। আমিও উঠলাম। দরজার পর্দা সরিয়ে যা দেখলাম তাতে আমি পাথর হয়ে গেলাম।

শোবার ঘরটা দোতলায়। সামনে একটা বারন্দা আছে। বারন্দা থেকে নীচের উঠোনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। উঠোনের একপাশে হাঁস মুরগীর খাঁচা। আমার প্রায় ৩০টা হাঁস মুরগী আছে। রত্না হাত বাড়িয়ে একটা মুরগী ধরল। অন্যান্য হাঁস মুরগীরা তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো। বুঝলাম, তারা বিপদের আশঙ্কায় চীৎকার করছে। সুতরাং ব্যাপার নতুন নয়।

রত্না মুরগীটার গলাটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল। মুরগীটার পাখা ঝট্ পট্ করাটা একটু বাদেই থেমে গেল। তখন রত্না তার পাখাগুলো ছিঁড়ে ফেললো। তার পরে কাঁচা মুরগীটাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেললো। মুরগীর হাড় চিবুনোর শব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

চুপচাপ চলে এলাম। ব্যাপার দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আমার দেওয়া ইনজেকশনের প্রভাবে প্রচণ্ড ক্ষুধা পায় তা জানি, কিন্তু এভাবে কাঁচা মুরগী খাওয়াটা আমি কল্পনা করতে পারি নি।

মনকে সান্ত্বনা দিলাম হয়ত খাবার জিনিষ কিছু না থাকায় রত্না মুরগী খেয়েছে। কিন্তু সকালে ভুল ভাঙল।

আইসক্রীম খাব বলে খানিকটা দুধ ফ্রিজে রাখতে গেলাম। ফ্রিজে অনেক খাবার জিনিষ থরে থরে সাজান আছে, সুতরাং

সমস্ত খাবার জিনিষ ছেড়ে রত্না ইচ্ছে করে জ্যান্ত মুরগী খেয়েছে।

হঠাৎ আর একটা সন্দেহ হ'ল। পোল্ট্রীতে গেলাম। যেখানে দাঁড়িয়ে রত্না মুরগীর গলাটা কামড়ে ধরেছিল, তার আশেপাশে রক্ত থাকা উচিত। কিন্তু কোথাও একবিন্দু রক্ত দেখতে পেলাম না। অর্থাৎ মুরগীর রক্তটা রত্নার তেষ্টা মিটিয়েছে। হঠাৎ ঝি, চাকর কেন ছুটিতে গেছে তা বুঝতে পারলাম।

মনে পড়ল, বাঁদর আর ঘোড়া—দুটোই শেষকালে খুনী হয়ে উঠেছিল। আজ রত্নাও তাইই হ'য়ে উঠেছে ধরতে হবে। মনটা দমে গেল। বুঝলাম, আমার এতদিনের সাধনা সম্পূর্ণ অসফল হয়ে গেছে। যদি রত্নার ওপরে আমার একসপেরিমেণ্ট সফলও হয়—তাহলেও ত' আমি হেরে গেছি, কেননা রত্না আর রত্না নেই। আমার একসপেরিমেণ্ট তাকে কাঁচা-মাংস-খেকো রাক্ষসীতে পরিণত করেছে।

কে জানে কেন আমার মনে হল, রত্না দু' একদিনের মধ্যেই কাউকে খুন করবে। ঘোড়াটা তার সহিসের গলা কামড়ে ধরে ছিল—রত্না কার গলাটা কামড়ে ধরবে? আমার নয়ত?

দশ

কথাটা মনে আসা মাত্র একটা দারুণ আতঙ্কে আমার মনটা ছেয়ে গেল। রত্না তখনও তার সেই শেষরাত্রের খাওয়া খেয়ে অগাধে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, এক বিছানায় থাকলে হয়ত আগেই রত্না আমার গলাটা কামড়ে ধরত। এক ঘরে অবশ্য থাকি—বলা যায় না হয়ত আজ রাত্রেই রত্না আমার ওপরে আক্রমণ চালাতে পারে।

মনের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করল। দারুণ একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। এটা আমারই হাতের সৃষ্টি রাক্ষসী—এ আমার রক্ত পান করবেই—এ বিষয়ে আমার মনে কেমন

একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল। গিলোটিন যে আবিষ্কার করেছিল তার মৃত্যু গিলোটিনেই হয়েছিল। আমার বেলা তার ব্যতিক্রম হবে না। আমার মন বল্লে এ তোমাকে খাবেই।

আর আইসক্রীম খাবার ইচ্ছে রইল না। ঠিকে ঝি এল, নতুন—এর আগে কোন দিন দেখি নি। চা করতে বললাম।

ফ্রিজ থেকে জলখাবারের জন্য খাবার বের করতে লাগলাম। একদিকে কয়েকটা আপেল চোখে পড়ল। দু'টো খাবার টেবিলে রাখলাম।

—"এ কি! তুমি এসব নিজে কেন করছ?"— রত্নার গলা। ফিরে দেখি রত্না কাপড় বদলে মুখ ধুয়ে এসেছে—চোখে ঘুমের আমেজ। বল্লাম, "একটু তাড়া আছে।"

—"একটু বোসো। আমার সঙ্গে চা খেয়ে গেলে কি খুব দেরী হবে?"

—"বেশ, তা খাচ্ছি। তুমি এসো।"

রত্না চলে গেল। ভাবলাম আপেলগুলো কেটে রাখি। প্রথম আপেলটাকে চার টুকরো করলাম। দ্বিতীয় আপেলটা কাটতে যাচ্ছি হঠাৎ রত্নার পায়ের শব্দ পেলাম।

শব্দটা শোনামাত্র আমি হঠাৎ নার্ভাস হয়ে গেলাম। ছুরিটার ওপর বেশী চাপ পড়ে গেল—আমার বাঁ হাতের তর্জনীটা কেটে গেল। রক্ত বেরিয়ে এল—ডান হাত দিয়ে জায়গাটা চেপে ধরলাম।

রত্না চায়ের ট্রে টেবিলে রাখল। আমার দিকে চোখ পড়তেই জিগ্যেস করলে, "কি হয়েছে?"

—"কিছু নয়। সামান্য একটু কেটে গেছে।"

—"একটু টিঞ্চার আয়োডিন লাগিয়ে নাও। পার্বতী, একটু টিঞ্চার নিয়ে এসো। দেখি কেমন কাটল!"

রত্না আমার হাতটা ধরল। আমি ডান হাতটা সরাবামাত্র কাটা আঙুলটা থেকে তীব্র বেগে রক্ত বেরিয়ে এল। রক্ত দেখামাত্র রত্নার

চোখ জ্বলে উঠলো। ওর চোখের ভাষা আমি পড়তে পারলাম—বুঝতে পারলাম, ওর মধ্যেও ঘুমন্ত রাক্ষসীটা জেগে উঠেছে—আমারই সৃষ্টি রাক্ষসী—এর হাতে এবার আমার মৃত্যু অবধারিত—বুঝলাম, আমার আর কিছু করার নেই—

রত্না নীচু হয়ে আমার আঙুলটা হঠাৎ নিজের মুখে পুরে নিল। বাচ্চারা যেভাবে মায়ের দুধ খায় সেভাবে চুষতে লাগল।

তারপর অনুভব করলাম, রত্নার আঙুল চোষা শেষ হ'ল—বোধ হয় তখন আর রক্ত বেরুচ্ছিল না—নোনা স্বাদ শেষ হওয়া মাত্র—অনুভব করলাম রত্না'র দাঁত আমার আঙুলের মাংস হাড় থেকে আলাদা করে ফেললো—আর আঙুলের ধমনী থেকে ও রক্ত শোষণ করতে লাগল। বুঝতে পারছিলাম, আমার শরীরের সমস্ত রক্ত ঐ আঙুলটা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সারা শরীরে একটা অবসাদ—আমার বাঁ হাতের তর্জনীতে তীব্র বেদনা—যেন শেষ বারের মত নিজের অস্তিত্ব জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে। মনে হল এভাবে আমার শরীরের রক্ত শেষ হওয়া মাত্র রত্না আমাকে ঐ মুরগীটার মত চিবুবে। আমি চীৎকার করে উঠলাম।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানটা কি তা আমি বুঝতে পারলাম। সমস্ত চেতনা আমার সজাগ হয়ে উঠলো। আমি ডান হাতে আপেল কাটা ছুরিটা নিলাম। রত্না পাগলের মত আমার আঙুল চুষে চলেছে, কোন দিকে তার দৃষ্টি নেই। ওর জামা খুলে গেছে, ব্রেসারিটা দেখা যাচ্ছে। আপেলের ছুরিটা আমি ওর বাঁদিকের স্তনের পাশে ঢুকিয়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম সেটা দু'টো পাঁজরের হাড়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে গেল। গরম একটা তরল পদার্থ আমার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি সোজা সামনের দিকে, তিনি বর্তমানের কিছুই দেখছেন না, তা বুঝতে পারছিলাম—তাঁর দৃষ্টি অতীতের ছবি দেখছে। কিন্তু ভাল করে তাকিয়ে দেখি তাঁর দু'চোখের কোণে জল।

এ অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করা উচিত নয়। চুপ করে বসে থাকলাম। গল্পের নায়িকার এই শোচনীয় পরিণামে মনটা ভারি হ'য়ে উঠলো। কথা বলার মত অবস্থা আমারও ছিল না।

তিনি রুমাল দিয়ে জল মুছে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। সেটার চেয়ে কান্না বোধ হয় ভাল। বললেন, "আর কি, দিল্লী ত এসে গেল।"

বল্লাম, "হ্যাঁ। এবারে রেডী হতে হবে।"

তিনি বললেন, "আমার গল্পও শেষ হয়ে গেল। রত্নার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করে ছুরিটা চলে গেছল। হাসপাতালে ওর জ্ঞান হয়েছিল। মৃত্যুকালীন কয়েকটি কথা বলে মারা যায়। আমার আঙুলটা ডাক্তার বাদ দিয়ে দেয়।"

একটু ইতস্তত করে জিগ্যেস করলাম, "আচ্ছা, কোর্টে মামলা ওঠে নি?"

"হ্যাঁ, উঠেছিল। আমি ভেবেছিলাম ফাঁসি হবে। কিন্তু যে সত্যই পাপী তার সাজা ফাঁসীতে হয় না। ভগবান তাকে সাজা দেন। আমি আমার দোষ স্বীকার করেছিলাম। কিন্তু কোর্ট আমার কথা মানল না। কোর্টে প্রমাণিত হ'ল যে, আমার স্ত্রী পাগল হ'য়ে গেছলেন। আর আমার কাজটা আত্মরক্ষার্থে, কাজেই বেকসুর খালাস পেলাম।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন, তার পর বললেন, "আপনাকে আমি যেসব কথা বললাম, সে কথা প্রকাশ করবেন না। আমার অনুরোধ। আজ পনের বছর ধরে এ সব কথা চেপে

আছি। কাউকে বলি নি। আপনাকে কেন শোনালাম জানি না। আচ্ছা, নমস্কার।"

ফিরে দেখি গাড়ী নিউ দিল্লী ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মোটঘাট নিয়ে নামবার আগেই ভদ্রলোক নেমে পড়লেন। হন্ হন্ করে ওভার ব্রীজের ওপরে হাঁটছেন দেখতে পেলাম।

আমি আমার কুলী নিয়ে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে টেম্পো নিলাম। কাছেই যাব, কনাট প্লেসে। আমার গাড়ীটা কনাট্ সার্কাসে ঢোকা মাত্র দেখলাম রাস্তায় ভীষণ ভীড়। একজন শিখকে অন্য কয়েকজন মিলে মারছে। ব্যাপার কি? পকেটমার নাকি?

আমার ড্রাইভার নেমে গেল। ফিরে এসে বললে, "একজন বুড়ো লোক ট্রাকে চাপা পড়েছে। পাব্লিক ক্ষেপে গিয়ে তাই ড্রাইভারকে মারছে।"

বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। বললাম, "কেমন বুড়ো?"

—"বোধহয় বাঙালী। দেখুন না।"

যা সন্দেহ করেছিলাম তাইই। দেখলাম রঞ্জন লাহিড়ী চীৎ হয়ে শুয়ে আছে, তার পেটের ওপর দিয়ে ট্রাকের চাকা চলে গেছে। প্রাণ বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, মুখে যেন হাসি লেগে আছে।

ড্রাইভারটা অন্যদিকে চীৎকার করছে। বলছে যে, তার দোষ নেই, হঠাৎ বাবুজী তার গাড়ীর সামনে এসে যায়।

চুপচাপ ফিরে এলাম। টেম্পোতে বসে হঠাৎ মনে হল—বোধহয় ড্রাইভারের কথাই ঠিক। নিজের জীবন কাহিনী কাউকে বলা বাকী ছিল—সেটা শেষ হওয়া মাত্র রঞ্জন লাহিড়ীর বেঁচে থাকার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছল।

চাঁদ নিয়ে কত হৈ চৈ···কিন্তু রোজ পূর্ণিমা কেউ করতে পারেন? পারেন চট্টোরাজ···

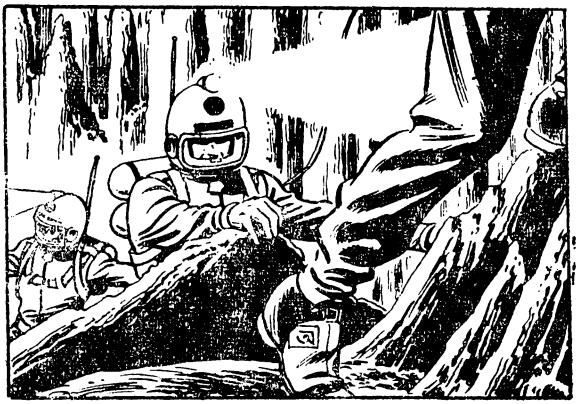

ডাঃ চট্টোরাজের চটক

সৌরেশ দে

···১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দ. ১লা জানুয়ারী, রাত্রি এগারোটা। ঘন আঁধারের রাজ্য নয়, ছমছমে জ্যোৎস্নায় ভরা রাত। ছমছমে জ্যোৎস্না কেন না শীতের হিম-উত্তরীয় দিয়ে ঘেরা। বিশেষ করে এই কাঠগুদামের: কাঠের বাংলোর চারপাশে বা আশেপাশে। বিরাট বড় কাঠের বাংলো। ভারী সুন্দর দেখতে। দোতলা অর্থাৎ নীচেটা ফাঁকা। ফরেষ্টের বাংলোর মত।

চারিদিক নিরিবিলি শুধু দেবদারু আর পাইন গাছের ভীড়। নির্মেঘ আকাশ তবু তারাগুলো দ্যুতিহীন। পাতলা কুয়াশা আর চাঁদের আলো তাদের ঝাপসা করে দিয়েছে। কোথাও কোন ঝিল্লীর আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। সব স্তব্ধ।

সী-লেভেল থেকে প্রায় ৮৫০০ ফিট্ উঁচুতে T-আকারের এই বাংলোর লেজের উইংএ ডাঃ চট্টোরাজের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার। গবেষণার ভারী উপযুক্ত স্থান। সামনের দিকে দুইপ্রান্তে বেডরুম। একটায় থাকেন ডাঃ চট্টোরাজ, অপরটায় তাঁর সহকারী মিস্

শিকদার। মাঝখানের প্রশস্ত ঘরটি ড্রইংরুম। বাহুল্য-বর্জিত সাজসজ্জায়, তবু যথেষ্ট সুন্দর। শিউলি অর্থাৎ মিস্ শিকদারের হাতের গুণেই বলতে হবে। এছাড়া লেবরেটরীর সাথে একটা লাইব্রেরী-কাম-রেষ্টরুম আছে। চাকর শম্ভু, দারোয়ান ভীম সিং এরাও এই বাংলোর বাসিন্দা।

*

যে সময়ের কথা হচ্ছিল ঠিক তখন ডাঃ চট্টোরাজ আর তাঁর সহকারী ভীষণ চিন্তিত। ঠায় বসে আছেন। কখনও গালে হাত দিয়ে, কখনও মাথায়। চুলের মধ্যেও আঙুলগুলো ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। সমস্যাটা খুবই গুরুতর! কারো মুখে কোন কথা নেই। কথা যা ছিল তা অনেক আগেই সারা হয়ে গেছে। এখন শুধু সমস্যার সমাধান। চাকর শম্ভু কখন কফি দিয়ে গেছে, এখন ঠাণ্ডা জল। টেবিলেই পড়ে রয়েছে, উভয়ের কোন হুঁস নেই। দারোয়ান ভীম সিং পেটা ঘণ্টায় এগারোটা ঘোষণা করেছে, তবু তাঁদের ধ্যান ভঙ্গ হয় নি। প্রতি ঘণ্টায় সময় ঘোষণা ডাঃ চট্টোরাজেরই নিয়ম। কারণ তিনি সময় হারিয়ে ফেলেন।

গবেষণাগারের উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় উভয়কে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। মস্ত গবেষণাগার। সমস্ত আধুনিক সরঞ্জাম ও সুবিধায় ভর্তি। সামনের টেবিলে ইলেকট্রনিক বার্ণার জ্বলছে। গ্যাসের ব্যবস্থা এখন অচল। কাঠের বাংলো, তাই আগুন নেভাবার সুবন্দোবস্ত একটু বেশীরকমের। ঘরের প্রতিটি কোণে এবং দেয়ালের মাঝে ঝুলছে ফায়ার এক্সটিংগুইসার। কনিক্যাল দেখতে রকেটের পকেট সাইজ। ঠিক ডাঃ চট্টোরাজ যেখানে বসে আছেন তার পাশেই দেয়াল থেকে ঝুলছে একটা। টেবিলে কমুয়ের ভর। বসে আছেন দুজনে মুখোমুখি, টেবিলের দুপাশে। সমস্যা কঠিন।

সমস্যার কথা পরে বলছি। আগে ডাঃ চট্টোরাজের কথা সেরে নিই। অবশ্য আপনারা সবাই মোটামুটি জানেন, ডাঃ চটুল চট্টোরাজ

উনোর আন্তর্গ্রহ উন্নয়ন পরিষদের বিশেষ ভারতীয় প্রতিনিধি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভারী গুণী লোক। সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম সবার মুখে মুখে ঘুরছে। তাঁর সুযোগ্যা সহকারী শিউলি শিকদারকেও এক ডাকে সবাই চেনে! মানুষের কল্যাণে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অদ্বিতীয় রকেট বিশেষজ্ঞ বলতে তাঁকেই বোঝায়। একমাত্র তাঁরই কৃপায় পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিলো-ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি বেঁচে যাচ্ছে। কারণ এখন রোজই পূর্ণিমা।

*

আপনারা জানেন নিশ্চয়ই এই প্রাত্যহিক পূর্ণিমা ডাঃ চট্টোরাজের অবদান। কর্মময় জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান বলতে পারেন। কত অক্লান্ত পরিশ্রম আর হিসাব নিকাশ করে উনি গত বছর চাঁদকে সেট করেছেন, সে কথা সবাই সসম্ভ্রমে স্মরণ করছে। এমন সুন্দরভাবে সেট করেছেন যে, চাঁদ আর পিছিয়ে পড়ছে না। রোজই সূর্যাস্তের পর দেখা দিচ্ছে। তাই রোজ পূর্ণিমা।

অবশ্য কথাটা যত সহজে বলা গেল, তত সহজে হয়নি। এই জন্য ডাঃ চট্টোরাজকে তাঁর সহকারী এবং সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে সাতবার চাঁদে যেতে হয়েছে। ভারত সরকার তার জন্য প্রজেক্ট-মুনে খরচ করেছে ৭০০ কোটি টাকা। ব্যাপারটা কিন্তু শিউলির মগজে প্রথমে আসে। চাঁদের মত এতবড় একটা পদার্থ মাসের মধ্যে আদ্দেক দিনের বেশী অকেজো থাকে কেন? চাঁদকে ঠিকভাবে সেট করতে পারলে বিদ্যুৎ-শক্তির খরচ অনেক কমে যাবে। যে কথা সেই কাজ।

চাঁদ যে রেটে পিছিয়ে পড়ছে, তার মাস্ ইনটু ভেলসিটি বার করে ফেললেন ডাঃ চট্টোরাজ। তারপর প্রয়োজন এমন একটা বিরুদ্ধ শক্তির যা চাঁদের সেই পিছুহটা বন্ধ করতে পারবে। মহাশূন্যে রকেট ফায়ার করে বা জেট্ ছেড়ে মহাকাশযান এগিয়ে পিছিয়ে দিক পরিবর্তন করতে পারে। কৃত্রিম উপগ্রহ আর স্পেসষ্টেশনগুলিও পারে।

চাঁদ একটা বড় উপগ্রহ মাত্র, চাঁদকেও নড়ান সরান সম্ভব। কিন্তু কি করে?

বিরাট জেট্-এর প্রয়োজন। অতবড় রকেট বা জেট চাঁদের বুকে তৈরী করা সম্ভব নয়। একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও নয়। ষ্টেসনারী জেট রকেটের বডি তৈরীর খরচের কথা-তো চিন্তাই করা যায় না। তাছাড়া একটা রকেটে হবে না। অনেকগুলো একসাথে চাই। কারণ জ্বালানীর পরিমাণ যে অসম্ভব রকমের বেশী। তবেই না অতবড় চাঁদটাকে হটানো যাবে। আবার অতো জ্বালানীই-বা চাঁদের বুকে কোথা পাওয়া যাবে? চাঁদের মরুভূমি চষলেও হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে না। তরল হাইড্রোজেন তো পরের কথা।

হঠাৎ ডাঃ চট্টোরাজের মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। সে দিন সেদিন চাঁদের বিরাট ম্যাপটা খুলে বসে আছেন। অসংখ্য ফোড়ার মত চাঁদের গায়ে মৃত আগ্নেয়গিরিগুলি ছড়িয়ে রয়েছে। এক জায়গায় মানে সী অব্ টেম্পেষ্টের কাছে দেখলেন কার্বঙ্কল-এর মত আশে পাশে প্রায় পঞ্চাশটা আগ্নেয়গিরিমুখ রয়েছে। ব্যস, তারপরদিন ডাঃ চট্টোরাজ শিউলিকে নিয়ে চাঁদে চলে গেলেন। পাশপোর্ট পেতে তাদের বেগ পেতে হয়নি। কারণ ভারত সরকারের প্রজেক্ট-মুনের তিনিই তখন সর্বেসর্বা। চার্টার্ড রকেটে গিয়েছিলেন। পাইলটকে বললেন একেবারে ঠিক স্পটে নামতে। সী অব টেম্পেষ্টের পাশে। রেট্রো রকেটের সাহায্যে ঠিক হিসেব করে নেমে গেলেন তাঁরা।

নেমে যা দেখলেন তা খুবই আশাপ্রদ; ডাঃ চট্টোরাজ এতোটা আশা করেন নি। মৃত আগ্নেয় গহ্বরে শুধু মুখ বাড়িয়ে দেখলেন না। রকেট লিফ্টের সাহায্যে ভেতরে নেমে ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখে এলেন। তলায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—ইউরেকা, শিউলি পেয়েছি পেয়েছি, এই ছাখো গ্রানুলেটেড জিঙ্ক্। বাংলায় যাকে বলে দস্তা। স্তরটাও বেশ পুরু বলেই মনে হচ্ছে। ড্রিল করে দেখে নিলেই হবে। এখন শুধু কয়েকশো লিটার সালফ্যুরিক এ্যাসিড

আনার অপেক্ষা।

শিউলি ব্যাপারটা বুঝলো, বললে—হাইড্রোজেনের সমস্যা না হয় মিটলো, কিন্তু রকেটের বডি তৈরী করবেন কি দিয়ে?

মৃদু হেসে ডাঃ চট্টোরাজ বললেন,—না, তুমি এখনও আমার সুযোগ্য হয়ে উঠতে পারলে না। মিছেই আগ্নেয়গিরির ক্রেটারের ভেতর দিয়ে কয়েকশো ফিট্ নেমে এলে! ও সমস্যা আমি কাঠগুদামে বসেই মিটিয়ে ফেলেছি!

তবু শিউলি বুঝতে পারে না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তখন ডাঃ চট্টোরাজের করুণা হয়। তিনি বুঝিয়ে বলেন,—দেখ, এতবড় চাঁদটাকে হটাতে জেট্ ব্যবহারই সবচেয়ে সুবিধাজনক। এই আগ্নেয়গিরির এক-একটা ক্রেটারকে সংস্কার করে সস্তায় ষ্টেসনারী জেট চেম্বার বানানো সম্ভব। এতো সস্তায় আর অন্য কিছুতে হবে না। কারণ মস্ত বড় বড় জেটের প্রয়োজন। যে রোগের যে দাওয়াই। এখানেও ঠিক তাই ব্যবহার করতে চাই। তাছাড়া এই সব মৃত আগ্নেয় গহ্বর চাঁদের ভিতর অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। ফলে জেট্ হিসেবে ধাক্কাটা কেন্দ্রের দিকে বেশ ভাল ভাবেই দেবে। আর সোনার চাঁদ হটতে বাধ্য হবে। অবশ্য হটা মানে এক্ষেত্রে গতিটাকে বন্ধ করে স্থির করে দেওয়া। তার জন্যে খুব নিখুঁত হিসাবের প্রয়োজন। আরো একটা হিসাব আছে সেটা হল, ঠিক সূর্যের বিপরীতে যখন চাঁদটা থাকবে অর্থাৎ পূর্ণিমার সময়ে এই কারবার সারতে হবে। অমাবস্যার সময়ে করলে চিরকাল অমাবস্যাই থেকে যাবে পৃথিবীতে।

*

যে কথা সেই কাজ। প্রজেক্ট-মুনের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ণিমা সেটিং নির্দিষ্ট হয়ে গেল। ডাঃ চট্টোরাজ পাশাপাশি কয়েকটা ক্রেটার সুবিধামত বেছে নিলেন। সমস্ত ক্রেটার সার্ভে করে নক্সা করে ফেলা হল। কোন্‌টার কি সংস্কার করতে হবে

তাও ঠিক হয়ে গেল। ডাঃ চট্টোরাজ খুব সুন্দরভাবে প্ল্যান করেছেন। ক্রেটারের একেবারে ভেতরে যেখানে দস্তার স্তর রয়েছে সেখানে হাইড্রোজেন গ্যাস প্ল্যান্ট, পরে লিকুইড হাইড্রোজেন প্ল্যান্ট, আর একদম ওপরে ক্রেটারের মুখগুলো জেট্ নজলে রূপান্তরিত করা হল। বাকি সমস্ত সাজসরঞ্জাম ক্রেটারের ভেতরে বসান হল। অন্যান্য যা ফুয়েল লাগে তাও ভরা হল।

তারপরে এক কৃষ্ণা প্রতিপদের রাতে তীব্র জেট্ ছেড়ে চাঁদ স্থির হয়ে গেল। অর্থাৎ চাঁদ যতটা পিছিয়ে পড়েছিল একদিনে ঠিক ততটা ঠেলে নিয়ে এসে তাকে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত করা হল। সেই সঙ্গে চাঁদের পিছিয়ে পড়াও বন্ধ হল। এই সবই আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন। আর তার পর থেকে রোজই পূর্ণিমায় পুলকিত হচ্ছেন। ডাঃ চট্টোরাজ আর মিস্ শিউলি শিকদার উভয়ের পুলকের সীমা না থাকারই কথা। কিন্তু কয়েকদিন যেন কি হয়েছে, পুলকের আলোক মুখে নেই। দুজনেই বেশ বিমর্ষ। গুরুতর সমস্যাপীড়িত।

*

সমস্যাটা সত্যিই গুরুতর। ডাঃ চট্টোরাজের কর্মময় জীবনের সমাপ্তি বোধ হয় শীঘ্রি ঘনিয়ে আসছে। বাতের দোষ ডাঃ চট্টো-রাজের বংশগত। আগে অমাবস্যা পূর্ণিমায় দেখা দিত। এখন রোজই। কেন না এখন রোজই পূর্ণিমা। এই পূর্ণিমায় দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের আনন্দের সীমা নেই। তবু হাজার হাজার বেতো রুগী বিরক্ত হয়েছেন। রোজ তাঁর কাছে শত শত নালিশ আর্জি আসছে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষেপে গেছেন তাঁর ওপর। এবছর মুসলমানরা ঈদের চাঁদ দেখতে পায় নি। হিন্দুরা দুর্গাপূজায় মহাষ্টমীর ক্ষ্যানের পূজা সারতে পারেনি। পাঁজিওয়ালারা অনেকেই ফাঁকা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন; কারো সাথে কারো মিল নেই। মিলবে কি করে? চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধির

বর্তমানেই তাঁরা টিকি ছেঁড়াছেঁড়ি করতেন, আজ অবাধ স্বাধীনতা।

ডাঃ চট্টোরাজের জীবনের ওপরও কয়েকটা এ্যাটেম্পট্ হয়েছিল। কিন্তু খুব অল্পের জন্যই প্রতিবার বেঁচে গেছেন। বোধ হয় ভগবানের কৃপাতেই। ভারত সরকার তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেছেন। কাঠগুদামে তাঁর বাংলোর চারপাশে সর্বদা নিরাপত্তা বাহিনী প্রস্তুত। সেজন্য একটা আলাদা সাবডিভিসন করতে হয়েছে সরকারকে।

কিন্তু এতোতেও ডাঃ চট্টোরাজ বিচলিত হন নি। আজ আর চুপ থাকা যায় না। আজ গুরুতর বাতে তিনি প্রায় শয্যাশায়ী। বাত তাঁর বংশগত অধিকার। কি ভাবে সেই অধিকার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তাই আজ একমাত্র চিন্তার বিষয়। সেই সকাল থেকে দুজনে ভাবছেন, যখন বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে বাতের ব্যথা তাঁকে ফের বিছানায় টেনে নিয়েছিল। এখন রাত এগারোটা। আজ আর না ভেবে উপায় নেই। ডাঃ চটুল চট্টোরাজ স্থবির হতে চলেছেন। সত্যিই তো এই অভাবনীয় ব্যাপার তাঁদের আগে মনে হয় নি। কিন্তু কি আশ্চর্য! মানুষ আজ এতো অসাধ্য সাধন করেছে আর সামান্য বাতের ওষুধ বার করতে পারে নি। মিছেই মানুষের বড়াই। ডাঃ চট্টোরাজ আর তাঁর সহকারী মিস্ শিকদার বেশ মিইয়ে পড়েছেন।

আরো অনেক পরিকল্পনা ডাঃ চট্টোরাজের ছিল। তিনি স্থির করেছিলেন, পৃথিবীর চারপাশে আরো কয়েকটা চাঁদ জুড়বেন। বৃহস্পতির অতোগুলো চাঁদের দুটো অন্ততঃ সরিয়ে এনে পৃথিবী আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেবেন। ওই একই পন্থায় উড়িয়ে আনা যাবে। মঙ্গল গ্রহটা চাঁদের মতই আগ্নেয়গিরিতে ঝাঁঝরা, ওটাকে দিয়েও অনেক কাজ হতে পারে। কিন্তু কিছুই আর করা হল না। শিউলিও আপত্তি করছে।

অবশ্য যুক্তি আছে যথেষ্ট। শুধু চাঁদ এনে জুড়লেই হল না। আবার বাত বাড়বে। একেবারে পঙ্গু করে দেবে। তাছাড়া

জোয়ারের ঠেলায় বোম্বাই, লণ্ডন, কোলকাতা, বোষ্টন তাবৎ দুনিয়ার বড়বড় সহর বন্দর জলের তলায় তলিয়ে যাবে। অতএব ওসব চলবে না। এখন শুধু বাত নিরোধ পরিকল্পনার কথা দুজনে ভাবছেন। টেবিলে কনুয়ের ভর দিয়ে। হাতের ওপর মাথা ছেড়ে দিয়ে। কাঠগুদামের কাঠের বাংলোর ল্যাবরেটরীর কক্ষে। বাইরে ছমছমে জ্যোৎস্না রাত এগারোটা।

এতক্ষণে শিউলি মুখ খুললো,—পেয়েছি চটুলদা পেয়েছি, চাঁদটাকে পূর্ণিমার বদলে প্রতিপদ বা চতুর্দশীতে সেট করলেই সব সমস্যা মিটে যাবে।

—ঠিক বলেছ শিউলি, আমিও এই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু আবার অনেক খরচ পড়ে যাবে। তবে গতবারে ৭০০ কোটি পড়েছিল, এবারে অতো লাগবে না। ১০০ কোটির মধ্যেই হয়ে যাবে। কারণ সব কিছু এখনও সাজানই আছে। তবে একবার দেখে নিতে হবে দস্তার লেয়ারটা যথেষ্ট আছে কিনা। জেটের নজ্‌ল্‌গুলো সংস্কার করে নিতে হবে।

যে কথা সেই কাজ। ডাঃ চট্টোরাজ পরিকল্পনা পেশ করলেন ভারত সরকারের কাছে। একশো কোটি টাকায় পরিকল্পনা এক বছরের মধ্যেই শেষ হবে। পাঁচ বছর লাগবে না। লক্ষ লক্ষ বেতো রুগীর ব্যথায় অধীর হয়ে ভারত সরকার রাজী হলেন। তবে প্ল্যানিং কমিশন পরিকল্পনাটার কিছু রদবদল করলো। তারা শুক্লা ত্রয়োদশীতে চাঁদ সেট করার পক্ষপাতী। দিনটা ভাল সর্বসিদ্ধি যোগ। লোকেরা খুসী হবে সারা বছর সর্বসিদ্ধি যোগ পেয়ে। তাছাড়া চতুর্দশী থেকেই বাতের তারস সুরু হয়, থাকে প্রতিপদ পর্যন্ত। অন্যদিকে অসুবিধার কিছু নেই, শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ বেশ বড়ই হয় এবং সন্ধ্যার আগেই আকাশে ওঠে। শেষ রাতের দিকে ডুবে যায় বটে তবে তখন আর চাঁদের প্রয়োজন কারো থাকে না।

প্ল্যানিং কমিশন খুবই বিবেচনা করে একশো কোটির বদলে

দেড়শো কোটি টাকা মঞ্জুর করলেন। কারণ একদিনের বদলে দুদিন এগিয়ে চাঁদকে সেট করতে হবে। ডাঃ চট্টোরাজ আর শিউলি শিগগির চাঁদে চললেন। সালফ্যুরিক এ্যাসিড থেকে সুরু করে ডিজেল, কেরোসিন আর সাজসরঞ্জাম সবই বিশেষ বিশেষ ড্যাকোটা রকেটে চাঁদে গিয়ে নামলো। ডাঃ চট্টোরাজ প্রতিটি ক্রেটারে নেমে দস্তার লেয়ার পরীক্ষা করে দেখলেন। সবই সন্তোষজনক। শিউলিও পাশেই ছিল। সাফল্যের আশায় দুজনের মুখেই হাসি ফুটল।

তারপর সেই মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত হল। এবারে ডাঃ চট্টোরাজ চাঁদে বসেই জেট ফায়ার করবেন স্থির করেছেন। গতবার পৃথিবী থেকে রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে করেছিলেন। এবারে সাহস বেড়েছে। বেশ মজাই হবে, চাঁদের সাথে কিছুটা উড়ে যাবেন তারা। শিউলিরও তাই মত। তাছাড়া গতবারের অভিজ্ঞতায় এবারের সময় ইত্যাদির নিখুঁত হিসাব তাঁদের আয়ত্তে। অতএব ভয়ের কিছু নেই। পৃথিবী থেকে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করার কিছু নেই। প্রচুর উত্তেজনার মধ্যে ডাঃ চট্টোরাজ বোতাম টিপেছেন। সমস্ত জেটগুলো একসাথে আকাশে গর্জে উঠল। যদিও তিন কিলোমিটার দূরে তাঁরা বসে, তবু শব্দে কানে তালা লেগে যায়। প্রচণ্ড সাদা ধোঁয়ায় আকাশ ছেয়ে গেল। পৃথিবী থেকে এদৃশ্য এত ভাল দেখা যেত না। স্টপ্‌ওয়াচ ধরে শিউলি সময়ের হিসাব রাখছে। অল্পক্ষণ পরেই চাঁদ সরতে আরম্ভ করলে। স্পষ্ট অনুভব করা গেল সেটা। তীব্র জেটের ধোঁয়া ছেড়ে চাঁদ এগিয়ে চলেছে। শিউলি স্টপ্‌ওয়াচে নজর রাখছে। ডাঃ চট্টোরাজ অধীর হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

—থ্রি মিনিট্‌স্ মোর টু-গো। শিউলি ঘোষণা করলে।···টু মিনিট্‌স্ মোর টু-গো। শিউলি আবার ঘোষণা করলে।···ওয়ান মিনিট মোর টু গো। শেষ চেতাবাণী দিয়ে শিউলি সঙ্গে সঙ্গে সেকেণ্ড গুণতে সুরু করলে।—ফিফটি নাইন, ফিফটি এইট, ফিফটি

সেভেন···থ্রি, টু, ওয়ান···স্টপ।

ডাঃ চট্টোরাজ সঙ্গে সঙ্গে বোতাম ঘোরালেন। কিন্তু ওকি! সবকটা জেট তো থামল না! একটা এখনো চলছে! কি সর্বনাশ! উত্তেজনায় ডাঃ চট্টোরাজের মাথার সবকটা চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। যান্ত্রিক গোলযোগে তাহলে গোটা প্ল্যানটাই ভেস্তে যাবে। আর ধীরে ধীরে চাঁদ বাবাজী অমাবস্যায় পৌঁছে গেলেই তো সব মাঠে মারা গেল। পাগলের মত ছুটলেন ডাঃ চট্টোরাজ। শিউলি তাঁকে মানা করছে। ওই ভয়ঙ্কর সাইটে যাওয়া মানেই অবধারিত মৃত্যু। তিন কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু ডাঃ চট্টোরাজ তিন লাফে পৌঁছে গেলেন। তিন সেকেণ্ড সময়ও লাগল না। চাঁদে গ্র্যাভিটি খুব কম, তাই লাফ দিয়ে প্রায় উড়েই যাওয়া যায়। শিউলি তাকে ধরে রাখতে পারলে না। কিন্তু ফলো করেছে। শিউলি হালকা, তাই এসে ধরে ফেলল। একদম জড়িয়ে ধরেছে। ডাঃ চট্টোরাজ হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। জেট তাকে থামাতেই হবে। কিন্তু শিউলি নাছোড়বান্দা। কিছুতেই তিনি হাত ছাড়াতে পারছেন না···উঃ কি অসহ্য উৎকণ্ঠা···

*

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ডাঃ চট্টোরাজের! একি, সামনে শিউলি দাঁড়িয়ে। সর্বাঙ্গ ফেনায় ঢাকা। টেবিলের ওপর রকেটের পকেট সাইজ ফায়ার এক্সটিংগুইসারটা সমানে ফেনার তুবড়ি ছুটিয়ে চলেছে। তিনি দৃঢ় মুঠিতে ধরে আছেন। শিউলি কিছুতেই সেটা ছাড়াতে পারছে না। ধস্তাধস্তি চলেছে। লেবরেটরীতে টেবিলের দুপাশে কখন তারা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পাশের দেয়াল থেকে হুক খসে ফায়ার এক্সটিংগুইসারটা টেবিলে পড়ে ফায়ার হয়ে গেছে। তাই এই বিভ্রাট। স্থানঃ রঞ্জনপুর ইউনিভার্সিটির রিসার্চ লেবরেটরী। কাল: ২রা জানুয়ারী ১৯৬৫। শিউলির শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী ডাঃ চট্টোরাজ! গতকাল নতুন বছরের হুল্লোড়ের কোন নেপথ্য হাত এতে আছে কি না কে জানে!

ভীষণ অভিমানে ভেঙে পড়ে শিউলি জানিয়ে দিল—তোমায় আমি কোন দিনই বিয়ে করবো না, চটুলদা।

পাখার দরকার নেই, এয়ার কণ্ডিশন্‌ড্‌ ঘরেরও দরকার নেই···আয়নায় আলো প্রতিফলিত হয়···সেইভাবে যদি গরমকে ঠিকরে দেওয়া যেত···!

পৌষ-চৈত্রের পরাজয়

দুলাল পাল

১

অফিস থেকে ফিরে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। অবাক হলাম। একা একা মেসে থাকি। কালেভদ্রে দু' একজন আত্মীয় তাদের নিজেদের দরকারে আমায় স্মরণ করে। চিঠিপত্র পাওয়া বিস্ময়কর ঘটনা। অতএব একটু বেশী কৌতূহলী হয়ে টেলিগ্রামটা পড়ে

ফেললাম। শুধুমাত্র এইটুকু লেখা ঃ নীলুদা, চলে এসো—সীমা। সীমা! সীমা এতদিন বাদে আমায় স্মরণ করল! সেই কবে ছোটবেলায় এক সঙ্গে খেলাধূলা করেছি। সম্পর্কে আমার খুড়তুতো বোন হলেও আমায় নিজের ভাই-এর মত যত্ন করত। সেই কবে ওর বিয়ের সময় ওকে দেখেছিলাম, তারপর আর দেখা হয়নি।

অতএব যাওয়াই ঠিক করলাম।

খোঁজ করে জানলাম, সন্ধ্যা ৭-১৫ মিনিটের আগে কোন গাড়ী নেই। চাঁপাহাটে পৌঁছতে রাত ৯টা। তারপর সাইকেল রিকসা—আধ ঘণ্টা। অর্থাৎ সীমার বাড়ী পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা হয়ে যাবে।

গাড়ীতে বসে সীমাকে ভাববার নিশ্চিন্ত অবসর পেলাম ঃ হয়ত ওর স্বামী কোথাও বেরিয়ে গেছে, বাড়ীতে ফেরেনি বহুদিন। যা খামখেয়ালী সৃষ্টিধর বাবু! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানের জগতে তাঁর সর্বদা আনাগোনা। বছর আটেক আগে—সীমার ছেলের অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম—সমস্ত বাড়ীটা দুনিয়ার লতাপাতা, শাকসবজী, তরকারী গাছে ভরা। সারা ভারত জুড়ে তাঁর পরীক্ষাগার। কোথায় কোন্ কায়দায় আনাজ পাওয়া যায়, কোথায় কেমন ধরনের কীট-পতঙ্গ পাওয়া যায়, এই সব নিয়ে তাঁর দিন কাটত। দিন তিনেক ছিলাম সেবার। তার মধ্যে একদিন দুপুরবেলা সৃষ্টিধরবাবু আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। কাচের বাক্সে রাখা একটা গাছ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, চেনো এটা?

কচু গাছ! হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলাম।

এটা গরমের সময় বাঁচে? আপন মনে প্রশ্ন করেছিলেন সৃষ্টিধরবাবু।

না। সহজভাবে বলেছিলাম।

এটাকে গরমের সময় বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বলেই সৃষ্টিধরবাবু

অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

একথা সীমাকে বলেছিলাম। সীমা গর্বের সঙ্গে বলেছিল, জান নীলুদা, উনি একদিন জগৎজোড়া খ্যাতি পাবেন। এই বয়েসেই কি সব বড় বড় বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন। আমাকে বলেছেন, এর ফলে পৃথিবী থেকে দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

সৃষ্টিধরবাবুর উদ্দেশ্যে সেদিন আমার মাথা নত হয়ে গিয়েছিল।

হয়ত সেরকম কোন গবেষণার উদ্দেশ্যে বাইরে গেছেন। হয়ত বা সীমার ছেলেটার অসুখ হয়েছে বা অন্য কোন সাংসারিক বিপত্তি দেখা দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা মত এসেছিল। এক ভদ্রলোক ধাক্কা দিয়ে বললেন, আপনি এখানে নামবেন বলছিলেন না?

জেগে দেখি আষাঢ়ের মেঘ সারা আকাশ জুড়ে। ঝির ঝির করে বর্ষা হচ্ছে। ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে স্টেশনে নেমে পড়লাম। ঘড়িতে তখন ৯-১৫ মিঃ। ট্রেন ১৫ মিঃ লেট।

স্টেশনে লোকজন খুব কম। যা দু' একজন ছিল। কিছুক্ষণের ভেতরে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। স্টেশনের বাইরে এসে একটা সাইকেল রিকসা ডাকলাম, বললাম, চাঁপাহাটে যাবে?

রিকসাওয়ালা অনিচ্ছার সুরে বলল, সে তো এখান থেকে তিন কোশ! এত রাত্রে যেতে পারব না।

সে তো জানি কিন্তু আমার না গেলেই যে নয়, মরীয়া হয়ে বললাম; আর তা বাদে এত রাতে একা একা যাওয়া···

রিকসাওয়ালা যে কোন কারণেই হোক একটু নরম হল, আপনি এখানে নতুন বুঝি?

সাবধান হয়ে বললাম, না, একেবারে আনকোরা নই তবে অনেকদিন বাদে।

পাঁচ টাকা দিতে হবে। রিকসাওয়ালা মূল্যবান সম্মতি জানাল।

পাঁ—চ—টা—কা!

হ্যাঁ, দেখছেন তো কেমন টিপটিপে বিষ্টি পড়ছে।

তা' বলে এত ?

আপনার ওখানে গিয়ে আসার সময় আর সোয়ারি পাব না। তার যুক্তি স্বীকার করতে হল। যেতে যেতে রিকসাওয়ালার সঙ্গে অনেক গল্প হল। ওর পরিচয়, ব্যবসা, ওদিককার চাষ-আবাদ। লেখাপড়ার সুবিধে বা অর্থনৈতিক উন্নতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলাম। রিকসাওয়ালা সাধ্যমত জবাব দিল।

খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করল এবং সেটা স্বাভাবিক প্রশ্ন: কোথায় যাবেন বলুন তো ?

সৃষ্টিধরবাবুর নাম করলাম। রিকসাওয়ালা কোন মন্তব্য করল না। নীরবে রিকসা চালাতে লাগল।

একটা বড় মাঠের ধারে আমাকে নামতে বলে বলল, ওই বাড়ীটা।

ওর হাবভাবে একটু ঘাবড়ে গেলাম। রিকসাওয়ালা টাকা নিয়ে চট করে চলে গেল।

অন্ধকারেও মনে হল, মাঠটার চারিধারে বেশ জঙ্গল। আমার ঠিক সামনের দিকটায় মাঠের ওপারে একটা বাড়ি উঁকিঝুঁকি মারছে। বাড়ীটায় কোন আলো জ্বলছে না—ওখানে লোকজন থাকার আভাসও মিলছে না।

বর্ষাতি দিয়ে সারাদেহ ঢেকে মাঠটা পার হলাম। বাড়ীটার কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম, একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী। বাড়ী-টার সামনে নানা ফুলের বাগান। উঠোনের এককোনে একটা শিউলি গাছ। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছি, কি করে কি করি; এমন সময় একটা মেয়েছেলে তর তর করে সামনে এগিয়ে এল। তার নিঃশব্দ চলায় চমকে পেছিয়ে যাচ্ছিলাম, সে কাছে এসে নীচু গলায় বলল, নীলুদা না ?

তুই! আট বছর পরেও সীমার চেহারা কোন পরিবর্তন হয়নি।

সীমা আমার মুখ চাপা দিয়ে বলল, চুপ! তারপর ওকে অনুসরণ করবার জন্য আমায় ইসারা করল।

পায়ে রবার সোলের জুতো, অতএব নিঃশব্দে চলায় কোন অসুবিধে হল না।

মিনিট দুই পরে আমরা দোতলায়—আলো-বাতাসময় এবং সুসজ্জিত ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সীমা বলল, বসো—আমি আসছি।

ঘরে একটা নীল আলো জ্বলছিল। ডিস্‌টেমপার করা দেয়ালে কোথাও এতটুকু দাগ নেই। একদিকের দেয়ালে একটা ফুল সাইজ ছবি—বছর আটেক বয়সের ছেলে। নিশ্চয়ই সীমার।

দামী খাট, তার ওপর মোলায়েম বিছানা। এককোণে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। একটা হাতলহীন চেয়ার। টেবিলের উল্টোদিকে দু'পাশে দুটো আলমারি—বইয়ে ঠাসা। একমনে সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। সীমা ফিরে এল, তার হাতে একটা বিরাট থালায় ভিজে চিঁড়ে, তাতে গোটা চারেক মোটাসোটা পাকা কাঁঠালী কলা আর একটা পাথরের বাটিতে একগাদা দই। সেগুলো আমার সামনে রেখে বলল, তুমি আসবে আমি জানতাম। আমি যন্ত্রচালিতের মত চিঁড়ে কলার সৎকার করলাম। খাওয়ার পর সীমা আমায় মিনিট পনেরো বিশ্রাম নিতে বলল।

২

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সীমা আমায় টেনে তুলল, বলল, নাও ওঠো! আর এক মিনিটও নষ্ট করা যাবে না।

ভয়ে এবং বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম, কেন?

সীমা লজ্জিত হয়ে বলল, তাইতো, তোমাকে কিছু বলা হয়নি?

সীমার ফরসা মুখখানা নীল আলোয় একেবারে কালো হয়ে গেল, একটা অব্যক্ত বেদনা ফুটে উঠল। ক্ষণেকের মধ্যে আবার সেখানে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা দেখা দিল, বলল, দীপুকে বাঁচাতে হবে—এর বেশী

কিছু বলার সময় নেই ; কারণ খুনীটা রাত বারোটার সময় জেগে উঠবে।

আমার সর্বাঙ্গে লোম খাড়া হয়ে উঠল, বুকের ভেতরে রক্ত হিম হয়ে গেল, নীচুগলায় জিজ্ঞাসা করলাম, কি করতে হবে ?

আমার গলার স্বরে সম্ভবতঃ আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল, সীমা বলল, তুমি না বেটাছেলে ! তোমার ভরসাতে তো আমি এগোচ্ছি।

সীমার এই মন্তব্য আমাকে আরো রহস্যের দিকে ঠেলে দিল এবং মনে মনে ভাবলাম, প্রায়-ভুলে যাওয়া বোনের উপকার করতে এসে একি বিপদে পড়লাম !

সীমা আঁচলের চাবি দিয়ে একটা আলমারি খুলে কি খুঁজতে লাগল। একটু চিন্তা করার আমার পেলাম : এতক্ষণ এই বাড়িতে এসেছি কিন্তু সীমা ভিন্ন অন্য কোন জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ পাইনি। সর্বত্র কেমন একটা ভৌতিক আবহাওয়া। সীমার ঘরটা ভিন্ন সমস্ত বাড়ীটা অন্ধকার। সীমার ছেলে, সীমার স্বামী বা চাকর-বাকর এরা কোথায় ? আমি কি মৃত্যুপুরীতে এলাম ? না, স্বপ্ন দেখছি ? পকেটে হাত দিলাম—না, এই তো রেলের টিকিটখানা, লেখা চাঁপাহাট।

দীপু হাত ঘুমিয়ে পড়েছে। সীমার স্বামী হয়ত বাড়ী নেই। আমার এতক্ষণে খেয়াল হল—তাই তো সীমার কোন মানসিক ব্যাধি হয়নি তো ! পাগল হয়ে যায়নি তো ?

নাও, ধরো !—কাজে লাগবে। সীমা আমার হাতে একটা রিভলবার দিতে দিতে বলল।

সীমাকে কোন প্রশ্ন করতে ভুলে গেলাম।

চল ! সীমা হাতে একটা জোরাল টর্চ নিয়ে তাকে অনুসরণ করবার জন্য আদেশ দিল, হাতে আর মাত্র দেড় ঘণ্টা—এর ভিতর যা হবার হবে।

ঘটনার দ্রুততা, আকস্মিকতা, রহস্যঘনতা আমায় একেবারে পুতুল খেলার পুতুল করে তুলল।

আমরা অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। সিঁড়ির নীচে একটা ঘর, সেই ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

সীমা আচমকা বলল, জীবনবীমা করেছো?

হ্যাঁ! জবাব দিলাম।

অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম সীমা খানিকটা স্বস্তি পেল।

চাবি দিয়ে দরজা খুলল, বলল, এসো! আমি ভেতরে ঢুকলে সীমা দরজাটা ভেতর দিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর খানিকদূরে গিয়ে আমরা ডান দিকে ঘুরে ছোট্ট একটা দরজার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। দরজাটা দেখতে খানিকটা লিফ্‌টের দরজার মত। সীমা টর্চ জ্বালতে জ্বালতে সেই অন্ধকার ভেদ করে নিল। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম এবং অনুভব করছিলাম যে, আমরা ঠাণ্ডা রাজ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। কুড়ি পঁচিশটা সিঁড়ি নামবার পর সীমা একটা দরজা খুলল আর আমার সামনে এরটা রূপকথার রাজ্য হঠাৎ হাজির হল। .....কাচের বড় বড় জলাধার। কাচের ঘরে ছোট ছোট জঙ্গল। জলাধারে কালো কালো মাছ নড়ছে। কোনটা বড়, কোনটা মাঝারি, কোনটা বড়। প্রত্যেকটা জলাধারের ভেতরে একটা থার্মোমিটার, একটা আলো। আর জলাধারগুলো কি ঠাণ্ডা! ছোট্ট জঙ্গলের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখি, সেখানে ইঁদুর, খরগোস, আরশুলা, মাছি, আরো নানারকম পোকামাকড়। সেগুলো কি বিশ্রী কালো। আমি সবকিছু চিনতে পারছিলাম, কেননা প্রত্যেকটা জলাধার বা জঙ্গলের ঘরে জীবজন্তুর নাম লেখা ছিল। দেখতে দেখতে চলছিলাম বলে সীমার অনেক পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। সীমা পেছনে ফিরে আমায় ডাকল, পরে দেখো, এখন এসো।

সব দেখেশুনে মনে হল, এটা একটা পরীক্ষাগার। পরীক্ষাগারের একদিকে ছাদ- সমান উঁচু একটা দরজা। সেই দরজাটা ঠেলে আমরা একটা ঘরে পৌঁছলাম। সেই ঘরের কোণে একটা অল্প-জোরের আলো জ্বলছে, ঘরটা বেজায় ঠাণ্ডা। ঘরের ভেতর চোখ বুলাতে

বুলাতে মেঝের ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। যা দেখলাম, তা অবিশ্বাস্য!···একটা ছফুট লম্বা কালো জানোয়ার লম্বা হয়ে শুয়ে আছে মেঝের ওপর। অমন কালো রং জীবনে দেখিনি। পরনে একটা কাপড় লুঙ্গির মত করে পরা। বোধ হয় ঘুমন্ত। মাথা-মুখ-হাত-পা-পিঠ সব ঘন কালো। আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। ইসারায় সীমাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কে?

সীমা আমার দিকে বোকার মত চাইল, চোখ দুটো তার ছল ছল করে উঠল।

আমি অবাক চোখে কালো জীবটাকে দেখতে লাগলাম। অবিকল মানুষের মত। কিন্তু এত কালো যে, কয়লার আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে।

সীমা ঘরের এককোণ থেকে দু জোড়া বেড়ি নিয়ে এল। এক-জোড়া আমার হাতে দিয়ে বলল, তুমি হাতে লাগাবে। আমি পায়ে। কিন্তু খুব সাবধানে—জেগে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

আমার হাত-পা অন্তরাত্মা সব কেঁপে উঠল। সীমা আমাকে ঘড়ি দেখতে বলল। দেখলাম, রাত ১১-৩০ মিঃ। আর মাত্র আধ ঘণ্টা! আমরা দুজন একই সময়ে কালো জীবটার হাতে-পায়ে বেড়ি লাগিয়ে দিলাম।

কালো জীবটা নড়চড়া করল না।

এতক্ষণে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সীমা: অন্য ঘরে চল। কালো জীবটার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা এখানে পড়ে থাক। আর আধ ঘণ্টা বাদে জেগে উঠবে, চারদিন আর ঘুমোবে না। অতএব এই আধ ঘণ্টার ভেতর যা করার করতেই হবে। বলতে বলতে সীমা আমাকে আর একটা ঘরের সামনে নিয়ে গেল। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি, একটা আট-নয় বছরের ছেলে একটা ছোট খাটে ঘুমোচ্ছে। তার মাথার দিকে কয়েকটা বিশাল বেল-জার, কিছু প্লাস্টিকের বল, কয়েকটা গ্যাস সিলিণ্ডার; আর একটা

ঝোলানো বোতলে অদ্ভুত সাদা অথচ পারার মত চকচকে পদার্থ। সেই বোতল থেকে একটা নল ছেলেটার মাথার কাছে আনা হয়েছে। ঘরটা মারাত্মক গরম।

সীমা আমাকে একটা চাবি দিয়ে বলল, যাও, গ্যারেজ থেকে গাড়ীটা বের করোগে।

যথারীতি গাড়ীটা বের করে রাস্তায় রেখে বাড়ী ঢুকলাম। কিন্তু একি? ধুমধাম আওয়াজে নিস্তব্ধ বাড়ীখানা গম গম করছে। ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়ে আবার চোখের মণি দুটো সেখানে আটকে গেল।

ঠিক বারোটা!

কালো জীবটা জেগেছে—দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। বাড়ীটার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম। গেঞ্জীটা ভিজে গেল। ধড়াম করে আওয়াজ হল—দৌড় দিলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সীমার বুকফাটা চীৎকার কানে ভেসে এল। পরীক্ষা-গারে গিয়ে দেখি, সেই কালো জীবটা সীমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে; সীমা এগোতে বা পেছোতে পারছে না। আর সেই কালো জীবটা রাগে ফেটে পড়ছে কিন্তু হাতে-পায়ে বেড়ি থাকায় কিছু করতে পারছে না। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে সে, আর সীমা পায়ে পায়ে দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। আমাকে দেখে সীমা সাহস পেল, হাত-ইসারায় রিভলবার চালাতে বলল। সীমার কোলে দীপু। কালো জীবটা সীমার হাব-ভাব দেখে হয়ত আমার উপস্থিতি বুঝতে পারল, পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল। আমি মরীয়া হয়ে ওর হাঁটু লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লাম। পড়ে গিয়ে প্রাণীটা গোঙাতে লাগল। সীমা দৌড়ে চলে এল, তাড়াতাড়ি চল, বেড়ি ছিঁড়ে গেলে আর রক্ষা নেই।

ওকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। সীমার হাত থেকে টর্চ নিয়ে জ্বালতে জ্বালতে বললাম।

সে-ই মস্ত ভুল হয়ে গেছে। সীমা নিরুত্তাপ ভাবে জবাব দিল।

আমরা যখন ওপরে উঠে এসেছি, তখন সিঁড়ি দিয়ে গোঙানীর আওয়াজ এল। সীমা চমকে উঠে বলল, আসছে! হাত-পায়ের বেড়ি বোধ হয় ভেঙে ফেলেছে! বলে সীমা বাড়ীর যেন সুইচ অফ করে দিল। তারপর আমরা উর্ধশ্বাসে দৌড় দিলাম। সেখান থেকে বাড়ীর গেট কতটুকু—২০০ গজ হবে। কিন্তু সেটাকে তখন মনে হল ৫০ মাইল!

গাড়ীর কাছে এসে আমরা পৌঁছলাম। সীমা বলল, সুইচ অফ করলাম যাতে ও অন্ধকারে কিছু না দেখতে পায়। কিন্তু ওপরে যদি উঠে আসে তবে অটোমেটিক দরজা খোলা পাবে। তুমি দীপুকে ধর, আমি অ্যালার্ম চেনটা অন্ করে দিয়ে আসি।

সে কোথায়?

বাড়ীর বাইরে। বলেই সীমা দৌড় দিল।

তার অর্থ? আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

সীমা জবাব দিল না। আমি বোবার মত বাড়ীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। চিন্তা করলাম, আমারই যাওয়া উচিৎ ছিল। কয়েকটা গুলীর আওয়াজ হল, আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। এমন সময় সীমা পাগলের মত দৌড়ে এল, বলল, পালাও! পালাও!

তিনজনে গাড়ীতে উঠে স্টার্ট দিলাম।

পেছনে ফিরে দেখি তাসের ঘরের মত সমস্ত বাড়ীটা ভেঙে পড়ছে আর নানা পশুপাখী জন্তু-জানোয়ারের মরণ-চীৎকারে জায়গাটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের মত হয়ে উঠেছে। আর তার মাঝ থেকে একটা মস্ত সিংহের মরণ-আর্তনাদ ভেসে আসছে। গাড়ির গতিবেগ সর্বোচ্চ করলাম। খানিকক্ষণ বাদে পেছন ফিরে দেখি, সীমা এলিয়ে পড়েছে। হাত তুলে দেখি, নাড়ি নেই! কিন্তু সীমার কোলে সীমার একটা ডায়েরী পেলাম। সেই ডায়েরী পড়ে সব ব্যাপারটা পরে বুঝতে পেরে-ছিলাম।

৩

নীলুদাকে আজ আসতে বলেছি। ও নিশ্চয়ই আসবে এবং যখনই আসবে তখনই আমার কাজ সুরু হবে। তাই হয়ত আর ডায়েরী লেখার সুযোগ পাব না।

একজন দুর্ধর্ষ বৈজ্ঞানিক প্রতিভার কাছাকাছি থেকে জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। আমি আমার স্বামী সৃষ্টিধর চাকলাদারের কথা বলছি। মানুষের বস্ত্র সমস্যা সমাধানের উপায় আবিষ্কার করার এক অদম্য নেশা তাঁকে পেয়ে বসে পাঁচ বছর আগে। এই নেশাই তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিল। তিনি মাটির নীচে এক বিরাট পরীক্ষাগার গড়ে তুললেন। আচ্ছা সীমা বলত, আমরা শীত বা গরম অনুভব করি কেন? একদিন তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই তিনি বলতে লাগলেন: বাইরের যে তাপ সেটা আমাদের দেহের চেয়ে কম হলে আমরা শীত অনুভব করি, আর যদি বেশী হয়, তার গরম বোধ করি। তবে আমাদের সূর্য রয়েছে আকাশে। সেই সূর্য থেকে আমরা তাপ নিতে পারি ইচ্ছেমত কিন্তু কিসের সাহায্যে নেবো সেই তাপ?

এরপর একদিন আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন পরীক্ষাগারে। সে যেন এক শীতের রাজ্য। বড় বড় জলাধারের ভেতর মাছ রয়েছে, আর রয়েছে একটা আলো। কাচের ঘর তৈরী করেছেন, সেই ঘরে নানা ছোট ছোট জীব। তাদের ঘরেও একটা আলো। আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, সব মাছ বা জীবগুলো একেবারে চুলের মত কালো।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কেমন দেখছ?

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, যে ভাববার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলাম।

বলেছিলাম, কি?

যাঃ, এটা বুঝলে না? উনি হাসতে হাসতে বললেন, শীতের বিরুদ্ধে লড়াই। কালো রং তাপ গ্রহণ করতে পারে সবচেয়ে বেশী, তাই এদের রাত্রের মত কালো করে দিয়েছি।

এইভাবে তিনি চাল, গম, তরিতরকারী, আরশোলা, টিকটিকি, ইঁদুর, বেড়াল—সব কিছু কালো করে ফেললেন। এই সব হতে লাগল এবং তিনি ধীরে ধীরে কেমন যেন আমাদের কথা ভুলতে লাগলেন। শেষ পরীক্ষা হিসেবে নিজের ওপর সেই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলেন। তারপর থেকে আর আমার সামনে আসতেন না। জানি না, কি জন্য। তবু তাঁকে একদিন দেখলাম এবং দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। এত কালো তিনি!

বহুদিন এইভাবে কাটল। হঠাৎ একদিন আমায় ডাকলেন, বললেন, একটা ভুল হয়ে গেছে, সীমা।—আমি শুধু শীতের কথা চিন্তা করেছি। গরম কাল আসায় বুঝতে পারছি সেই ভুলটা। অসহ্য গরমে আমি মরে যাচ্ছি। ঘরটাকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করেছি কিন্তু এটা তো সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই ভাবছি, শীত-গ্রীষ্মের সঙ্গে সমান ভাবে লড়তে পারে এমন একটা উপায় বের করতে হবে। তারপর একটু থেমে বললেন, দেখেছ, আয়নায় আলো পড়ে আবার সেটা বেরিয়ে যায়; খুব সামান্যই সে ধরে রাখতে পারে। তেমনই ভাবে আমাদের দেহের ওপর যদি এমন একটা স্বাভাবিক আবরণ দিতে পারি, যাতে তাপ প্রতিফলিত হয়ে বেরিয়ে যাবে, তবে মানুষকে বিশেষ করে এসিয়া আফরিকার মানুষকে পায় কে?

ব্যস্, সেদিন ওই পর্যন্ত। আর একদিন তিনি আমায় তাঁর পরীক্ষাগারের একটা বিশেষ ঘরে নিয়ে গেলেন, আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেখলাম, সেখানে সবকিছু রূপোর মত চক চক করছে। ছাগল-ভেড়া-কাক- রুই কাতলা সবকিছু আয়নার মত স্বচ্ছ।

মানুষ সুন্দরও হবে আবার শীতগ্রীষ্মও তাকে কাবু করতে পারবে না। তিনি আত্মগতভাবে বলেছিলেন।

এরপর ওঁর সঙ্গে আমার কোন কথাবার্তা হয়নি। দিন চারেক আগে ঘুম থেকে উঠে দেখি দীপু তার বিছানায় নেই। কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। বুঝলাম সে বিজ্ঞানীর হাতে গিনিপিগ হয়েছে।

উনি কিছুকাল অভ্যাস করে করে চারদিনের ঘুম একদিন ঘুমোতে পারেন। তাঁর এই ঘুম এখান থেকে পালাবার সুযোগ আমায় এনে দিয়েছে।

সমস্ত বাড়ীটাই একটা বিরাট পরীক্ষাগার। কোন ঘরে গ্যাস চেম্বার, কোন ঘরে প্রেসার কণ্ট্রোলার বা অকসিজেন ভাণ্ডার। সমস্ত বাড়ীটা ওঁর পরীক্ষার সময় বিজলীগ্রস্ত করে রাখেন—যাতে বাইরে থেকে কেউ ওর ঘরে না ঢুকতে বা বিরক্ত করতে পারে। আর একটা বিপদজ্ঞাপক শিকলের ব্যবস্থা করেছিলেন, যা দিয়ে সমস্ত বাড়াটা ধ্বংস করা যায়। বিজ্ঞানী আমায় বলেছিলেন, দরকার হলে ওটা দিয়ে আমাকে এবং এই বাড়ীটাকে ধ্বংস করে দিও।

এর পরও ডায়েরীতে আরো কিছু লেখা ছিল, কিন্তু সেটা পড়তে পারিনি—আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

মাসিকপত্র

এপরিল সংখ্যায় পাবেন :

কিভাবে আরও সুন্দর করে আপনার
অবসর সময় কাটাতে পারেন

আধকপালে যন্ত্রণা : কেন হয়, কি করে সারে; অটো-সাজেশ্চন দিয়ে নবজীবন পেতে পারেন; উত্তেজনায় শক্তি বাড়ে, না কমে? প্রতিবেশী হিসাবে আপনি কি ভাল?

দাম ২৫ পয়সা মাত্র

চাঁদের অজানা রাজ্যে

দুঃসাহসিক অভিযান ও আবিষ্কারের

ধারাবাহিক কল্পকাহিনী।

চাঁদের মেয়ে

বিশু দাস

॥ ১৪॥ মরুৎ মহাকাশযান ॥

শহরের অনেক জায়গায় আগুন জ্বলছে। লোকেরা প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছে আগুন নেভাবার, কিন্তু নেভা তো দূরের কথা উল্টে আরও ছড়িয়ে প'ড়ছে প্রতি মুহূর্তে। তারপর হঠাৎ এক সময় বিস্ফোরণ বন্ধ হ'য়ে গেলো। আমি এবং নি-লা-রা বারান্দার শেষ প্রান্তে গিয়ে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। হঠাৎ মন্ত্রের মত জ্বালামুখের গা বেয়ে প্রায় শ'খানেক সিঁড়ি নেমে এলো নীচে। কতকগুলো সিঁড়ি এসে ঠেকলো উঁচু বাড়ীর ছাদে। আর কতকগুলো সোজা নেমে এলো একেবারে নীচে পর্যন্ত। বুঝতে পারলাম মুচুকুন্দের পার্থিব জ্ঞান কাজে লাগান হচ্ছে বিবিসোনদের সাহায্য করার জন্যে।

ওদের মতলব বুঝতে পেরে বারান্দা থেকে সোজা ছুটলাম গেটের কাছে। কয়েকজন প্রহরী তখন সেখানটা পাহারা দিচ্ছে। ওদের মধ্যে কয়েকজনকে পাঠালাম শহরের লোকদের সাবধান করে দিতে, যেন একজন শত্রুকেও না নামতে দেওয়া হয় সে-তির মাটিতে। সেখান থেকে ফিরে এলাম নি-লা-রার কাছে এবং পরবর্তী ফলাফল লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। সে-তির ধ্বংস যে আসন্ন তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের সৈন্যরা শহরের লোকদের খবর দেবার আগেই প্রায় হাজারখানেক বিবিসোন উঁচু বাড়ীর ছাদে নেমে পড়েছে এবং তাদের সাহায্যে আর কতকগুলো নামছে তাড়াতাড়ি।

সে-তিরা বিবিসোনদের প্রথমটায় এমনভাবে আক্রমণ ক'রলো যে মনে হ'লো বাকি বিবিসোনরা বোধহয় নামতে সাহস ক'রবে না। নীচে ছোট ছোট পুতুলের মত দেখাচ্ছে মানুষগুলোকে। দু'দলে ভীষণ যুদ্ধ চ'লছে। দলে দলে বিবিসোন মারা প'ড়ছে সে-তিদের হাতে।

নি-লা-রা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ললো, "দেখো বজ্রপাণি, আমাদের লোকেরা কেমন লড়াই ক'রছে! এক-একজন সে-তি দশটা

বিবিসোনকে দেখে নিতে পারে। দেখো, কেমন পালাচ্ছে ওরা!"

দলে দলে বিবিসোন নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে এবং নীচে এসেই যুদ্ধ আরম্ভ ক'রে দিচ্ছে। হঠাৎ ওদের উৎসাহ যেন আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গেলো। দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ আরম্ভ ক'রলো বিবিসোন শত্রুরা। কারণটা বুঝলাম একটু পরে। বিবিসোনদের রাজাবে যুদ্ধরত সৈন্যদের মাঝ দিয়ে পার হ'য়ে আসতে দেখলাম। খানিকট আসার পর সে-তিদের মধ্যে কি যেন একটা ছুঁড়ে দিলো সে, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত শহরটা কেঁপে উঠলো। বহু সে-তি দেশপ্রেমিক প্রাণ দিলো সেই বিস্ফোরণের আঘাতে।

"বোমা—হাতবোমা ওগুলো!"—চীৎকার ক'রে উঠলাম আমি

"সেটা কি জিনিষ, বজ্রপাণি? ওরা আমাদের লোকদের নির্মম ভাবে হত্যা ক'রছে!" ধরা গলায় ব'ললো নি-লা-রা।

"হ্যাঁ নি-লা-রা। সে-তিদের ওরা হত্যা ক'রছে অতি নৃশংস ভাবে। পৃথিবীর মানুষ যেদিন প্রথম পা দিয়েছিলো চাঁদের মাটিতে সেই দিনটাকে নিশ্চয়ই না-ভা মনে মনে অভিশাপ দিচ্ছে।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, বজ্রপাণি।"

"এটা মুচুকুন্দের কাজ। সে পৃথিবী থেকে এই মানুষ মারার কল নিয়ে এসেছে সাথে ক'রে। এ'সব আধুনিক অস্ত্রের সামনে তোমার সৈন্যরা সাবেকি অস্ত্র নিয়ে কতক্ষণ ল'ড়বে? হয় সে-তিকে আত্মসমর্পণ ক'রতে হয়, নইলে ধ্বংস অনিবার্য।"

আমার বুকে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো নি-লা-রা। "সব শেষ হ'য়ে গেলো, বজ্রপাণি! আমাকে একটু মায়ের কাছে নিয়ে চ'লো। তারপর তুমি তোমার পৃথিবীর বন্ধুর সাথে ক'র। আমাদের জন্যে অনেক কষ্ট ক'রেছো। সে-তির ধ্বংসের সাথে সাথে তোমার ধ্বংস আমি দেখতে চাই না। বলো আমার কথা রাখবে?"

"মুচুকুন্দের সাথে একটা সন্ধিই শুধু ক'রতে পারি আমি, সেটা

হচ্ছে মৃত্যুর। আমরা দুজনেই যেদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো সেইদিনই সন্ধি হ'তে পারে আমাদের, তার আগে নয়।"

হঠাৎ কেমন একটা হতাশা এসে জুটলো মনে। হাত পা কাঁপতে আরম্ভ ক'রলো। মুচুকুন্দ বোধহয় বিষাক্ত গ্যাস ছেড়েছে!

"মৃত্যুকে আমি ভয় করি না, নি-লা-রা, যদি তুমি থাকো আমার পাশে। তোমাকে বাদ দিয়ে কোন আনন্দই আমার কাছে আনন্দ নয়।"

অশ্রুভেজা দুটি আয়ত চোখ তুলে আমার দিকে চাইলো নি-লা-রা। ওর অতল চাউনীতে কোথায় তলিয়ে গেলাম আমি।

"তুমি কি ব'লতে চাও, বজ্রপাণি?"

"আমি ব'লতে চাই যে আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"ওঃ বজ্রপাণি!" বলেই দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রলো।

ওর নরম পালকের মত দেহটা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললাম, "তুমি আমার ভালবাসা প্রত্যাখ্যান ক'রবে না তো?"

"তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই ভালোবেসেছি। হাবভাবে, কথাবার্তায় অনেকবার সেকথা প্রকাশ ক'রেছি। সে-তিরা জীবনে একবারই ভালবাসে এবং সে ভালবাসা তারা কোন দিনই ভোলে না।"

"আমি বুঝতে পারিনি. নি-লা-রা।"

"এর পর যা-ই ঘটুক না কেন আর আমরা দুজন দুজনকে ছেড়ে থাকবো না। যদি ম'রতে হয় দুজনে একই সঙ্গে ম'রবো। পরজন্মে আবার মিলন হবে আমাদের।"

কথা ব'লতে ব'লতে নি-লা-রার মায়ের ঘরের দিকে চ'ললাম, কিন্তু ঘরে তাকে পাওয়া গেলো না। নি-লা-রা চিন্তিত হ'লো। অন্য ঘরগুলো খুঁজে দেখলাম। শেষে এসে পৌঁছালাম যেখানে রাজা কিগরাতির মৃতদেহ প'ড়ে ছিলো সেই ঘরে। সে দৃশ্য দেখেই তাড়াতাড়ি নি-লা-রাকে বাইরে নিয়ে এলাম। আমার মনের ভাব বুঝতে

পেরে ও ব'ললো, "না, বজ্রপাণি, যত মর্মান্তিকই হোক না কেন আমাকে দেখতে দাও।"

তুজনে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম এক মহান প্রেমের দৃশ্য ; রাজা কিগরাতির দেহের বুকের ওপর প'ড়ে আছে রানীর মৃতদেহটা। বুকে একটা ছোরা আমূল ব'সে গেছে। আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো নি-লা-রা, তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে বাইরে এসে দাঁড়ালো। আগুন তখন সমস্ত শহরটা গ্রাস ক'রে ফেলেছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে নি-লা-রা ব'ললো, "শহরটাকে রক্ষা করার কোন সুযোগই ছিলো না আমাদের। দেশের কি তুর্ভাগ্য! যারা আগুন নেভাবে তারাই এসেছে মানো-তির হ'য়ে বাবাকে হত্যা ক'রতে! এদেশ তো পুড়বেই।"

"তোমার কি মনে হয় আগুন নেভাবার লোকেরা থাকলে এ আগুন নেভাতে পারতো তারা?"

"নিশ্চয়ই পারতো। নদী, ঝরনা, পুকুর এসব তো আছেই, তা ছাড়া প্রত্যেকটা বাড়ীর ওপরে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা রাখতে হয় ; এখানকার তাই নিয়ম। সুতরাং, আমার মনে হয় ওরা যদি নিজের নিজের কাজে লেগে থাকতো তা'হলে এ আগুন হয়তো এতক্ষণ নিভে যেতো।"

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পালাচ্ছে সব লোক। ওপর থেকে বিবিসোনরা বিস্ফোরক ছুঁড়ছে মাঝে মাঝে। আর্ত চীৎকার, হাজার লোকের ছুটোছুটির শব্দ এবং বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ মিলে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি হ'য়ে উঠেছে। তুদিক থেকে আক্রান্ত হ'য়ে সে-তিরা প্রাণ দিচ্ছে দলে দলে। বাঁচবার যখন আর কোন উপায় নেই তখন প্রিয়জনদের বুকে ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে নিজেরাই, তারপর নিজেরা প্রাণ দিচ্ছে শত্রুর অস্ত্রের আঘাতে।

কত লোক যে ওপর থেকে লাফিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা ক'রলো

তার ঠিক নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলো বুকের শিশুকে, কত স্ত্রী হারালো স্বামী তার হিসেব রাখে কে?

দুহাতে মুখ ঢেকে হতাশায় ভেঙে পড়া কণ্ঠে ব'ললো নি-লা-রা "বেচারা হতভাগ্য লোকগুলো! ওপর থেকে বিবিসোনদের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে দলে দলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ছে অন্ধকার অতল গহ্বরে। চ'লে এসো, বজ্রপাণি! এ দৃশ্য আমি আর দেখতে পারছি না।

আমাদের ঠিক নীচেই রাজপ্রাসাদের একটা গেট। কালকাররা পাঁচিলের ওপর দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে দেখে সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। প্রহরীরা পাথরের গেট আগলে ব'সে আছে তখনও, তবে তারা বুঝতে পেরেছে যে আর বেশীক্ষণ রাখা যাবে না। বহু শতাব্দীর দুর্ভেদ্য গেটগুলো এতদিন পর এবার ভেঙে প'ড়বে।

গেটের বাইরে কালকার সৈন্যরা থেমে গেলো, একজন কেবল এগিয়ে এলো সামনে। লোকটাকে দেখেই চিন্‌তে পারলাম সে মুচুকুন্দ। সেও আমাদের দেখতে পেলো।

আমার দিকে চেয়ে ব'ললো, "আমি আমার স্ত্রীকে দাবী ক'রতে এসেছি, এবং তোমার সাথেও সব হিসেব চুকিয়ে নিতে চাই আজ।"

ওর ডান হাতে গোল মত কি যেন একটা ছিলো, কথা শেষ করেই বার কয়েক সেটা মাথার ওপর ঘুরিয়ে পাথরের গেটটার ওপর ছুঁড়ে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে খণ্ডবিখণ্ড হ'য়ে ভেঙে প'ড়লো বিরাট বিরাট পাথরের থামগুলো। সে-তির শেষ বাধাটা পর্যন্ত স'রে গেলো। প্রায় অর্ধেক রাজভক্ত প্রহরী মারা গেলো এই দুর্ঘটনায়।

বাকি বিবিসোনগুলো হাতবোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভাঙা গেট পার হ'য়ে ভেতরে এসে ঢুকতে লাগলো। যে ক'জন প্রহরী বেঁচে ছিলো এবার তারাও প্রাণ দিলো।

নি-লা-রা আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললো, শেষ বারের মত তোমার ঠোঁটের মধুর স্পর্শ আমাকে পেতে দাও, বজ্রপাণি। তারপর

বার করো তোমার ছোরা।"

"না, না। তা আমি পারবো না নি-লা-রা", চীৎকার ক'রে উঠলাম আমি।

"কিন্তু আমি পারবো!" ব'লেই সে নিজের কোমর থেকে এক-টানে ছোরাটা বার ক'রে আনলো।

তাড়াতাড়ি ওর হাতটা চেপে ধ'রে বললাম, "এ তুমি কিছুতেই ক'রতে পারবে না নি-লা-রা। অন্য কোন উপায় ক'রতেই হবে।" হঠাৎ মাথায় এলো একটা উন্মাদ পরিকল্পনা। চীৎকার ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলাম, "পাখাগুলো কোথায়? তোমার সব লোক মারা গেছে। চল, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। মুচুকুন্দের সামনে ম'রতেও আমার ঘৃণা হয়।"

"কিন্তু যাবো কোথায় বলতো?"

"অন্ততঃ মরবার একটা উপায় তো আমরা বেছে নিতে পারবো। আমরা চ'লে যাবো সে-তি থেকে, শত্রুর দৃষ্টি থেকে অ-নে-ক দূরে।"

"তুমি ঠিক বলেছো, বজ্রপাণি। সময় খুব কম। ওপরে আসবার সিঁড়িটা খুঁজে বার ক'রতে কতক্ষণই বা লাগবে ওদের।" নি-লা-রা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চ'ললো সব চেয়ে উঁচু মিনারটাতে, যেখান রাজ পবিবারের ওড়বার সব সাজসরঞ্জাম রাখা হয়।

আমি নি-লা-রার পাখা দুটো লাগিয়ে দিলাম এবং নি-লা-রাও আমাকে সাহায্য ক'রলো আমার পাখা দুটো লাগাতে। জ্বলন্ত সে-তির শেষবারের মত দেখে উড়লাম বাতাসে। ইচ্ছে আছে যদি সম্ভব হয় আমাদের হারানো মরুৎ মহাকাশযানটাকে খুঁজে বার ক'রবো, কারণ ক্ষীণ আশা তখনও উঁকিঝুঁকি মারছে মনে; ওর হয়তো বেঁচে আছে।

ধোঁয়ার জন্যে আমাদের পালানো সম্ভবতঃ মুচুকুন্দের বা অন্য কারও নজরেই পড়েনি। পাহাড়, পর্বত, নদী, উপত্যকা পার হ'য়ে

বাতাসে ভেসে চ'ললাম সমুদ্রের সমতল তীরভূমির দিকে। নদীর মুখে 'ব' দ্বীপটা দেখে খুব আশান্বিত হ'লাম, এখান থেকে মহাকাশ-যানটা খুঁজে বার করা সহজ হবে।

উড়ে আস্‌তে আস্‌তে পথে বার কয়েক খাবারের সন্ধান ক'রেছি এবং বিশ্রামও ক'রেছি। সৌভাগ্যবশতঃ পথে কোন বিপদ বা দুর্ঘটনা ঘটেনি। শেষে সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁচেছি। এ জায়গাটা কিন্তু মোটেই পরিচিত ব'লে মনে হ'লো না।

ব্যাগে গ্যাসও কমে গেছে, সুতরাং খুব বেশীদূর হয় তো উড়েও যেতে পারবো না আর। দুজনে একটা নিরাপদ আস্তানা খুঁজে বার করার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়লাম।

তীরের থেকে কয়েক মাইল ভেতরে অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রের মাঝে। নি-লা-রাকে নিয়ে একটা দ্বীপে গিয়ে নামলাম। ফল ফুলের গাছে সবুজ দ্বীপটা; খাবারের অভাব হবে না অন্ততঃ, তাছাড়া পরিষ্কার জলের ঝরণাও আছে কয়েকটা।

দ্বীপগুলোতে লোকজন থাকে কিনা জিজ্ঞেস করায় নি-লা-রা ব'ললো যে ওগুলো সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। প্রথম দ্বীপটা ছেড়ে মাইল দশেক দূরের অন্য একটাতে গিয়ে নামলাম দিন কয়েকপর। এই দ্বীপটার অর্ধেকটা পাহাড়ে ঢাকা এবং বাকি অর্ধেকটা শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি। গোটা কয়েক ঝরণা এবং একটা বড় লেক আছে। চতুর্দিক ঘুরে জনপ্রাণীর দেখা পাওয়া গেলো না।

স্বর্গের সুষমা ঘিরে আছে জায়গাটা। আমরা দুজনে জীবনের বাকি দিনগুলো অনায়াসে কাটিয়ে যেতে পারবো, নিশ্চিন্তে নিরাপদে।

ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যে ছোট্ট একটা লতাপাতায় ছাওয়া কুটির বানিয়ে নিয়েছি আমরা দুজনে মিলে। দুজনে একসাথে বেরোই খাবার খুঁজে আনতে, তারপর অফুরন্ত অবসর কাটাই নি-লা-রার কোলে মাথা দিয়ে সমুদ্রতীরের নরম সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে। নি-লা-রাকে আমাদের ভাষা শিখিয়েছি। বেশ সুখে কাটছে জীবন, কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় কতদিন এভাবে কাটবে? মৃত্যু যদি এসে একজনকে কেড়ে নিয়ে যায়?

জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস আমার এবং নি-লা-রার অনেকটা ক'মে গেছে নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে।

একদিন খাওয়ার পর সমুদ্রের শীতল হাওয়ায় শুয়ে আছি চোখ বুজে, হঠাৎ নি-লা-রার খোঁচা খেয়ে চোখ মেলে তাকালাম। চাঁপার কলির মত একটা আঙুল দিয়ে কি যেন দেখাচ্ছে দূরে। সেদিকে তাকাতেই এক লাফে উঠে প'ড়লাম শোয়া অবস্থা থেকে। নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস ক'রতে পারছি না ঃ সমুদ্রতীরের সাথে সমান্তরাল ভাবে উড়ে যাচ্ছে আমাদের মরুৎ মহাকাশযান। চিনতে আমার একটুও ভুল হয়নি, কারণ আমার মায়ের মুখখানি যতখানি পরিচিত আমার কাছে এটাও তেমনি।

নি-লা-রার হাত ধ'রে কুটিরের দিকে টেনে নিয়ে গেলাম। পাখা লাগিয়ে, গ্যাস ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ওড়বার জন্যে তৈরী হ'য়ে গেলাম দুজনেই। ব্যাগে যেটুকু গ্যাস অবশিষ্ট আছে তাতে কোন রকমে ওড়া যাবে অতিকষ্টে, অবশ্য প্রচুর পরিশ্রম ক'রতে হবে এজন্যে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে মাইল দশেক পথ পার হ'তে হবে; তবু চেষ্টা ক'রতেই হবে। দু'জনে আমরা আকাশে উঠে পড়লাম···।

দূরে দেখা যাচ্ছে মন্থর গতিতে উড়ে চ'লেছে আমাদের মহাকাশ-যান্, সমুদ্রের একেবারে তীর ঘেঁষে। মনে আশা হ'লো হয়তো ওরা আমাদের দেখতে পেয়ে নিজেরাই এগিয়ে আসবে সাহায্যের জন্যে।

ক্লান্তিতে অবশ হ'য়ে আসছে হাত পা, কিন্তু থামা চ'লবে না। যেমন ক'রেই হোক ওখানে পৌঁছাতেই হবে। ইসারা ক'রে জানাতেও পারছি না, সুতরাং ওদের কাছে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। হঠাৎ মহাকাশযানের দিক পাল্টে গেলো। আমি একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়লাম। এত কাছে এসেও ধ'রতে পারলাম না; নিঃশব্দে সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছে আমার একমাত্র বন্ধু এবং সাহায্যকারী বারজুম্ মহাকাশযান।

একটা দ্বীপে নামলাম একটু বিশ্রাম ক'রবো ব'লে, ঠিক তক্ষুনি মহাকাশযানটা অদৃশ্য হ'য়ে গেলো পাহাড়ের আড়ালে। বিশ্রাম করা আর হ'লো না, আবার আকাশে উঠে প'ড়লাম। নি-ল-রার কষ্ট হচ্ছিলো খুবই কিন্তু সেকথা একবারও প্রকাশ করেনি সে। আমি চীৎকার ক'রে ব'ললাম, "এবার যতক্ষণ না ওটাকে ধ'রছি ততক্ষণ আর থামবো না, তাতে যদি মৃত্যু হয় তাও ভালো।"

খানিকটা যাবার পর আবার দেখতে পেলাম আমার আশার

প্রদীপ মরুৎ মহাকাশযানকে। বিরাট জ্বালামুখের দেওয়াল ঘেঁষে বৃত্তাকারে ঘুরছে। আস্তে আস্তে ছোট হ'য়ে আসতে লাগলো ঘোরার পথ, এবার হয়তো সোজা বাইরে বেরিয়ে পৃথিবীর দিকে যাত্রা কর'বে। আমি আমরণ প'ড়ে থাকবো এই অজানা রাজ্যে! কথাটা মনে হ'তেই' পাগল হ'য়ে উঠলাম আমি। যেমন ক'রে হোক ওখানে পৌঁছাতেই হবে। ভয়, দুশ্চিন্তা এবং হতাশা অভিভূত ক'রে ফেলেছে আমাকে। কিন্তু আমার সব আশা শেষ ক'রে দিয়ে জ্বালামুখের বাইরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো মহাকাশযান!

প্রাণপণে হাত চালিয়ে চ'ললাম ওটার পেছনে। বেচারা নি-লা-রা আমার সাথে তাল রেখে চ'লতে পারছে না—কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে দেখে নিতে হচ্ছে ঠিক আসছে কিনা। একটু পরে আমি জ্বালামুখের বাইরে বেরিয়ে এলাম। নি-লা-রা তখন ও শ'খানেক গজ পেছনে আমার।

ক্লান্তিতে বুক ফেটে যাচ্ছে, প্রতিটি অঙ্গ অবশ হ'য়ে আসছে, তবু আমরা থামছি না। জ্বালামুখের বাইরে এসেই দেখতে পেলাম ময়, মরিচি আর বিরাধ তিনজন ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে। আমি তখন মাত্র বিশ ফুট ওপরে।

মাথার ওপর অমাকে দেখতে পেয়েই মরিচি রিভলবার বার ক'রে গুলী চালাতে গেছে হঠাৎ বিরাধ তার হাতটা এক ধাক্কায় সরিয়ে দিলো, নইলে গুলীটা হয়তো আমার বুক ভেদ ক'রেই চ'লে যেতো।

"আরে এ তো দেখছি আমাদের ক্যাপটেন," একসাথে চীৎকার ক'রে উঠলো তিনজন। ওরা আমাকে চিনতে পেরেছে এতক্ষণে। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়া দেহ নিয়ে ডেকের ওপর এসে প'ড়লাম।

প্রথমেই মনে প'ড়লো নি-লা-রার কথা। তাড়াতাড়ি মহাকাশ-যানে চ'ড়ে খুঁজতে চল্‌লাম ওকে.....

"ইস", বলেই ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন সিট থেকে। তারপর জানলার দিকে চেয়ে ব'ললেন, "অপানাকে সারাটা রাত জাগিয়ে রেখেছি, বুঝতেই পারিনি। চলুন নামা যাক. প্যারিস এসে গেছে।"

"কিন্তু গল্পের শেষটা···?" চীৎকার ক'রে উঠলাম আমি। "গল্পটা এখনও শেষ হয়নি। গতরাতে ব্লুরুম হোটেলে মেয়েটা যখন নাচছিলো সেই সময় একটা কথা আপনি ব'লেছিলেন, যা শুনে আমার মনে হ'য়েছিলো পৃথিবীর দুর্দিন শীঘ্রিই ঘনিয়ে আসছে।"

"হ্যাঁ, আমিও ঠিক সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমার তৃতীয় জন্মের গল্পটা ব'ললাম এইজন্যে যাতে আপনার বুঝতে অসুবিধে না হয় কেন পৃথিবীর মানুষ অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছিলো সেই দুর্যোগে।"

"আপনি আবার পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন?" জিজ্ঞেস ক'রলাম আমি।

"হ্যাঁ, এসেছিলাম ২০৩৬ খৃষ্টাব্দে। দশ বছর চাঁদের দেশে কাটিয়ে শেষে আবার ফিরে এসেছিলাম পৃথিবীতে।"

একটু মুচকি হেসে তিনি ব'ললেন, "দেখছেন, এখনও আমি নিজেকে "আমি" ব'লছি। মাঝে মাঝে গোলমাল হ'য়ে যায়। ঠিক ক'রতে পারি না এটা কোন জন্ম চ'লছে আমার। বরং যদি বলি যে পঞ্চম বজ্রপাণি পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলো ২০৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। সেই বছরই পঞ্চম বজ্রপাণির ছেলে ৬ষ্ঠ বজ্রপাণির জন্ম হয়, তার স্ত্রী নি-লা-রার কোলে।"

"কিন্তু একটা জিনিষ বুঝলাম না যে, বিগড়ে যাওয়া মহাকাশ যান আবার পৃথিবীতে ফিরে এলো কেমন করে?"

"হ্যাঁ, একটা ভালো প্রশ্ন ক'রেছেন আপনি। ইঞ্জিনিয়ার বিরাধই এ অসাধ্য সাধন ক'রেছে। মুচুকুন্দ সাথে বন্ধুত্ব ক'রে তার কাছ থেকে কৌশলে মহাকাশযান মেরামত করার কাজ নিয়েছিলো। তখন অবশ্য ওর মতলবটা বুঝতে পারিনি। তাই মাঝে মাঝে ভাবতাম ছেলেটার মাথা খাচ্ছে মুচুকুন্দ।"

"আচ্ছা, আমি এবার চলি। আপনার আতিথেয়তার জন্য অনেক ধন্যবাদ," ব'লেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

কাতর কণ্ঠে আমি ব'ল্লাম "আর, নবম বজ্রপাণির গল্পটা? সেটা কি কোনদিন শুনতে পাবো না?"

"আবার যদি সাক্ষাত হয় আমাদের" একটু হেসে জবাব দিলেন তিনি।

"গল্পটা আমার শোনা চাই-ই", আমি ব'ললাম।

"আবার যে দিন সাক্ষাত হবে", আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি ক'রলেন। তারপর দরজা ঠেলে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলাম। স্প্রিংয়ের দরজাটা দড়াম্ ক'রে বন্ধ হ'তেই সম্বিত ফিরে পেলাম। আমাকেও নামতে হবে এবার···।

[শেষ হলো:]

ঘুমিয়ে পরীক্ষা পাশ—আজগুবী! কিন্তু নাড়ুদার
কাহিনী পড়ে একটা মেশিন বানাতে ইচ্ছে হবেই!

সহজ-পঠন পদ্ধতি

সুরজিৎ চৌধুরী

সকালবেলা এই সময় নাড়ুদার আগমন দেখে আশঙ্কিত হলাম। আর দুমাস বাদে আমাদের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষা। দিনরাত

তাই খেটে মরছি। সেই ভোরবেলা থেকে উঠে পড়ছি। একটা কোশ্চেনকে কোন রকমে ম্যানেজ করে এনেছি, আর এই সময়েই কিনা আর একটা কোশ্চেনের মতো নাড়ুদার আবির্ভাব! আশঙ্কিত হবার কারণ নাড়ুদার চরিত্রটি 'ইকেয়া-সেকির' সাথে তুলনীয় বলেই। গেল-গেল করেও যেতে চায় না।

যাইহোক্, মনের কালিমা আকস্মিকভাবে মুছিয়ে দিয়ে নাড়ুদাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম,—'আসুন নাড়ুদা। তারপর, কোত্থেকে?'

—'না, এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। রাস্তা থেকে তোর পড়া শুনতে পেয়েই এলাম।'

মনে মনে বললাম, না এলেই কি ভাল করতেন না? পড়াটা যখন বাইরে থেকে শুনতেই পেলেন! আমি জিজ্ঞেস করলাম, —'তা, চা খাবেন নাকি একটা কাপ?'

—'চা? না-থাক্। তোর আবার ডিস্টার্ব হবে।'

—'না-না, কী এমন ক্ষতি হবে আর।'

যদিও বুঝতে পারছি ক্ষতির আর কিছু বাকি থাকবে না। যে ভাবে জাঁকিয়ে বসেছেন, তা'তে ৯টার আগে উঠবেন বলে তো ভরসা পাচ্ছি না। এই সময়ে আরও একটা কোশ্চেনের আন্সার শেখা হয়ে যেতো। তবুও মৌখিক ভদ্রতার খাতিরে নাড়ুদাকে চায়ে আপ্যায়িত করতে হল। ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলাম।

—'তোর টেস্টের রেজাল্ট কেমন হল রে?'

—'না, বিশেষ সুবিধার নয়। ইংরাজীর রেজাল্টটা বড় খারাপ হয়েছে। ওটার জন্যেই একটু ভয়। আমাদের ইংলিশ-টিচার শচীন গুপ্ত তো আমাকে এলাউ করতে চাইছিলেন না। হেড্মাষ্টার মশাই বললেন একটা চান্স দেওয়ার জন্যে। তাই হেড্মাষ্টার মশাইএর জন্যেই এবার বৈতরণীর তীরে আসতে পেরেছি। শচীনবাবু অবশ্য হেড্মাষ্টার মশাইকে আমার সামনেই জানিয়ে

দিয়েছেন ছাট বয় মাস্ট কামব্যাক অনলি ডিউ টু ইংলিশ লিটারেচার। তাই ঠিক ভরসা পাচ্ছি না।'

—'দুর-দুর, ওরকম অনেকেই বলে। মনে সাহস রাখ্। দেখ্বি সব ঠিক হয়ে যাবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নিজের ওপর বিশ্বাস। এই জিনিসটা আজকাল অনেকেরই নেই। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলে নির্ঘাৎ পাশ করে যাবি। দু'মাস সময় আছে এখনও। দু'মাসে অনেক কিছু হয়ে যায়। দেখতে তো পাচ্ছিস দুদিন, মায় দুঘন্টায় এই পৃথিবীটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। আর তোর হাতে তো আছে এখনও দু-মাস সময়। এক কাজ কর্। এত বেশী পড়াশুনা করে শরীর নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।'

—'বলেন কি? পড়াশুনা করবো না! তবে কি পান-বিড়ি বেচব?'

—'বড় উল্টোপাল্টা বুঝিস। আমি কি তাই বলছি নাকি? কথার মাঝখানেই বাধা দেওয়া তোদের একটা 'মেনীয়া'। আগে শুনবি তো সবটা, তারপর তোর 'রিমার্ক পাস্' করিস।'

একটু খেয়ে নাড়ুদা তার সদ্যোত্থিত রাগটাকে চাপেন। এরপর বললেন—'এই আমার কথাই ধর্ না কেন। আমি কোনদিন সকালে সাড়ে ছটার আগে ঘুম থেকে উঠিনি। এমনকি পরীক্ষার দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর 'আর্লি টু বেড' কথাটা আমি আজীবন মেনে এসেছি। তাই বলে কি আমরা পাস করিনি, না পরীক্ষা দিইনি!'

—'আপনারা হ'লেন গিয়ে এক্সট্রা-অর্ডিনারী লোক। আপনাদের সাথে আমাদের তুলনা! কী যে বলেন।'

—'আরে না, তোরা যা' ভাবিস আমি তা' নই। তা'ছাড়া তোদের ডারউইন সাহেবও তো তার উলটো কথাই বলে গেছেন। আমাদের চাইতে তোদের ব্রেণ অনেক পক্ক। আর যারা অনাগত

তারা তো আরো বেশী হবে কয়েক ডিগ্রী। কিন্তু তবুও গুরুজনের প্রতি এজন্যে কখনও কারো শ্রদ্ধা ভক্তি কমবে না। একটা উচ্চশিক্ষিত ছেলে কখনও তার টিপ-সই দেওয়া বাবা-কাকাকে অশিক্ষিত বলে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা করতে পারে না। তোরাও বড় হ', দেখবি তখনও ছোটরা তোদের শ্রদ্ধা ভক্তি করবে। এ'টা না থাকলে সমাজ থাকতো না। দেশে অরাজকতা দেখা দিতো। তবে আসল কথাটা কি জানিস? আসল কথাটা হ'ল বুদ্ধি। বুদ্ধি খাটালে হয় না এমন কোনও কাজ নেই। বুদ্ধি খাটিয়ে পরীক্ষায়ও পাস করা যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে লোকে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাচ্ছে; আর তোর পরীক্ষা পাস—ওতো কিছুই না।'

বুঝলাম শুরু হয়ে গেছে। ফরমুলায় পড়ে গেছে। তাই নাড়ুদাকে আরও একটু উস্‌কে দিয়ে বললাম,—'তা ঠিক কথাই বলেছেন। বিজ্ঞান দিয়ে আজকাল কি না হচ্ছে! এমন কি পরীক্ষায় নকল করাও আজকাল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শুরু হয়ে গেছে বলে শুনতে পাই।'

—'বৈজ্ঞানিক নকল, সে কি রে? আজব কথাই শোনালি!'

—'অবাক হবার কিস্যু নেই। তবে সত্যি কিনা জানি না, ঘটনাটা আমি শুনেছি। এক ছেলে নাকি পকেটে করে ইয়ার-ফোন আর বেতার গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। ছেলেটির বাড়ী ছিল পরীক্ষার হলের কাছাকাছি। প্রশ্নপত্র পেয়ে ছেলেটি বাসায় সেটাকে পাচার করে দেয়। আর বাসায় বসে তার বন্ধু (?) সবগুলোর উত্তর একটা ট্র্যানজিস্টার প্রেরক-যন্ত্র দিয়ে ট্রান্‌স্‌মিট্ করছিল, ছাত্রটি তার ইয়ার-ফোনে সব শুনে শুনে খাতায় লিখছিল, পাস সুনিশ্চিত। কিন্তু ভগবান বিরূপ। ধরা পড়ে গেল ছেলেটি।'

—'ধরা পড়ে গেল? কেন, কী করে? গার্ড দেখে ফেলেছে বুঝি কোন তার-টার?'

—'না, তার দেখবে কি করে? ওতো তা'র ফুলহাতা সার্টের ভেতর দিয়ে এসেছে। ইয়ার-ফোনটাও ওর হাতে। আর ও কানের মধ্যে হাতটা চেপে রেখে চুপচাপ লিখছে। ধরে কার সাধ্যি!'

—'তবে? কি করে ধরা পড়ল?'

—'সে এক দুর্দৈব বলতে পারেন। কাছাকাছি আর এক বাড়ীর রেডিওতে ধরা পড়ে কথাগুলো। সে বাড়ীর একটি ছেলেও পরীক্ষার্থী। সে সকালে যা' যা' পড়েছে সে সব রেডিওতে শুনে তার সন্দেহ হয়। তার বাবা খোঁজ করলেন ব্যাপারটা। পরদিন তিনি ঐ বিশেষ মিটার ব্যাণ্ডে কিছুই শুনতে পান নি। সেদিন কোনও পরীক্ষা ছিল না, আবার তৃতীয় দিন প্রথম দিনের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সেদিন তিনি যোগাযোগ করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। এরপর খোঁজ খবর করা হল। আসামী বামাল ধরা পড়ল।'

—'বুদ্ধিটা কিন্তু খাটিয়েছিল ভালই। তবে একে বাহবা দেওয়া যায় না। এটা হল ফাঁকি দিয়ে পাস করা। আমি এতটা করতে উপদেশ দিতে পারি না। শত হলেও তো গুরুজন! নাকি বল?'

—'সে তো বটেই। তবে.....'

—'আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠি, কী বলিস? তোর আবার অনেক ক্ষতি হ'ল। তবে এত বেশী পড়িসনে।'

—'আহা, বসুন্ না, এত তাড়া কিসের।' আমি প্রস্থানোদ্যত নাড়ুদাকে বাধা দিই। দিনরাত খেটে মরছি পরীক্ষা পাসের জন্যে। এ অবস্থায় ছেলেরা পরীক্ষা-পাসের-দৈব এবং অব্যর্থ-মাদুলী' ধারণ করতেও রাজী হয়। সুতরাং সর্ট-কাট্ কোন পথ যদি

পাওয়া যায় সেটা তো গুপ্তধন প্রাপ্তির চাইতেও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তাই নাড়ুদাকে বাধা দিই।

—'আপনার চায়ের কথা বলে এসেছি। ওটা খেয়েই যান।'

—'ও, আচ্ছা।' বলে নাড়ুদা বসলেন। 'তবে শোন, সবটাই বলি। তাহ'লে আমি কি করে একটার পর একটা পাস করলাম সেই গোপন কথাটি। বুঝলি দীপু, পরীক্ষায় পাস করা কিছু না। ফেল করা যে কি জিনিস, আমার সত্যি বলতে কি, কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তবে একথাও ঠিক আমি তারপর থেকে বই নিয়ে বসিনি। তুই জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস। একথা সবাই জানে।'

—'সে-কী? বই না পড়েই পাস? এ যে একেবারে জলে না নেমে সাঁতার কাটার মতো!' আমি না বলে পারলাম না।

—'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। আরে; এই জন্যেই তো আমাকে নিয়ে পৃথিবীর সবদেশের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে। সব-দেশই চায় তাদের দেশে গিয়ে কাজ করি। গতকালও ওয়েস্ট জার্মাণী থেকে একটা অফার পেয়েছি। কিন্তু আমার একদম যাবার ইচ্ছে নেই। এখন যা করবার নিজের দেশে বসেই করব, এই বলে রাখলাম। বুঝলাম, অন্য দেশকে উন্নত করে কোনও লাভ নেই।'

এই সময় চায়ের কাপ-হস্তেন সংস্থিতা রূপীকে দেখে নাড়ুদার 'ফ্লো' আরও বেড়ে গেল।

'তাই ভাবছি এবার আমাদের দেশের জন্যে কিছু একটা করতে হবে। এই যে চীন ইত্যাদি দেশগুলো আমাদের দেশটাকে আক্রমণ করছে বারবার, সেটা কি জন্যে, জানিস?'

প্রশ্নটি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে নাড়ুদা চায়ের কাপে চুমুক দিলেন। আমি বললাম, 'এর একমাত্র কারণ হল আমাদের দেশের সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং উন্নতি দেখে হিংসায়।'

—'হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তবে আরও একটা কারণ হলাম আমি।'

—'আ-প-নি!?'

—'হ্যাঁ, আমি এই শর্মা।' নাড়ুদা নিজের বুকে আঙুলটা দু'বার ঠুকে দেখায়। 'আমাকে নেবার জন্যেই বার বার আমাদের দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে।'

—'তবে তো দেখছি আপনি কাশ্মীর সমস্যার মতো ভারতের আর এক সমস্যা! চিন্তার বিষয়!' আমি একটু বাক্যাঘাত করবার চেষ্টা করলাম।

নাড়ুদা ধমকে উঠলেন,—'থাক্, তোমাকে আর তার জন্যে মাথা ঘামাতে হ'বে না। খালি পাতিহাঁসের মতো প্যাঁক্ প্যাঁক্ করা। কেন, শুনিস নি? সেদিনও তো ময়দানে দাঁড়িয়ে আমাদের স্বর্গীয় প্রধান মন্ত্রী বুক ফুলিয়ে বলে গেলেন প্রাণ থাকতে আমাদের দেশের এক কণা জমিও বিদেশীদের হস্তগত করতে দেব না। আর আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নিয়ে বিদেশী রাষ্ট্রের নাক গলানো আমরা সহ্য করব না। এসব কেন বলেছেন?'

নিশ্চয় আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেন নি। কথাটা অবশ্য মুখ ফুটে বলতে সাহস করিনি। তবে এসব আবোল তাবোল শুনে ইচ্ছে হচ্ছিল রেডিওর নব্ ঘুরিয়ে পাকিস্তান সেন্টারকে এ অবস্থায় যেভাবে বন্ধ করে দিতাম, সেভাবে নাড়ুদার মুখটাকে যদি বন্ধ করা যেতো তবে এক্ষুনি তাই করতাম।

—'বুঝলি, পারলে সবাই করতো, কিন্তু এই দুটো দেশ তো একেবারে পাশে। তাই ওরা সোজাসুজি করে। আর অন্যরা করে পরোক্ষ ভাবে। এই যে খাদ্য, অর্থ, অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করছে। এসব কেন? সব কিছুর মূলেই আমি, সবাই আমাকে চায়। তবে হ্যাঁ, এ কথাও জেনে রাখিস, এই শর্মা যতদিন আছে ততদিন কোনও ভয় নেই। আর আমি যেদিন মরে যাব সেদিন

থেকেও কোনও ভয় নেই। কারণ তখন আর কেউ আসবে এদেশ আক্রমণ করতে। যাক্—এসব কথা কাউকে বলিসনে যেন। শুধু তোকে বলেই বললাম। তবুও বলতাম না। কথাটা উঠল বলেই বলে ফেললাম।'

(সুতরাং পাঠক মহাশয়, আপনিও অনুগ্রহপূর্বক এই অতি গোপনীয় কথাটি কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। আপনি 'আশ্চর্যে!'র পাঠক তাই বলে ফেললাম। যদিও ইচ্ছা ছিল না। আপনি ছাড়া আর কোন লোকই কিন্তু এসব কথা জানে না।)

নাড়ুদা চায়ের কাপটা রাখতে রাখতে বললেন,—'হ্যাঁ, যা বলছিলুম, পড়াশুনা আমি করিনি। তবে ফাঁকিও আমি দিইনি। ঘুমটা আমার একটু বেশী। এই ঘুমের জন্যে সন্ধ্যা সাতটা বাজতে না বাজতেই আমার চোখ বুজে আসতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই ভাত খেতাম বলতে পারিস। আবার সকালেও ঐ সাড়ে ছটা সাতটায় ঘুম ভাঙতো, কিন্তু এভাবে চললে বড় মুস্কিল। বহু বড় বড় ডাক্তার দেখানো হ'ল। শুধু মাত্র স্বর্গীয় ডঃ রায়ের কাছেই যাওয়া বাকি ছিল। অবশ্য তার আর দরকার হয়নি।'

—'কেন, এর আগেই ভাল হয়ে গেলেন বুঝি?'

—'না, ভাল আর হলাম কোথায়? বোতল বোতল ওষুধ, শিশিকে শিশি ট্যাবলেট-ক্যাপসুল গিললাম। আর ইন্‌জেক্‌শন; সেকথা আর নাইবা বললাম। আপাদমস্তক ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। এখনও যদি দুতিন গ্লাস জল খেয়ে পেটে একটু চাপ দেই তবে সারা শরীরের ইন্‌জেক্‌শনের ফুটো দিয়ে পিচকিরির মতো জল বেরুবে!'

একথা শুনে আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর?'

—'তারপর আর কি! কিছুতেই কিছু হ'ল না। ঘুম নিয়ে সমস্যা মিটল না। তাই তার সাথে অবশেষে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিই মেনে চললাম।'

'এই সময় টুকিটাকি করতে করতে একটা ট্র্যান্‌জিস্টার রেডিও বানিয়ে ফেললাম। সুতরাং একেবারে সোনায় সোহাগা বলতে পারিস। পড়াশুনা শিকেয় উঠল। যতক্ষণ জেগে থাকতাম ততক্ষণ রেডিও শুনে আর টুক্‌টাক্ করেই কেটে যেতো। এমন সময়ই ঘটল সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি। যার ফলে সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল।

'একদিন খুব ভোরবেলা উঠে আমার ছোট ভাই খগেন খুব আস্তে আস্তে রেডিওটা চালাল। খুঁজে পেতে একটা স্টেসন ধরল। ত'াতে একটা বাংলা গান চলছিল। ভল্যুমটা একটু কমিয়ে দিয়েছিল যাতে ও শুনতে পায় এবং আমার ঘুমের ব্যাঘাত না হয়। আমি তখন ঘুমে অচেতন কি জাগা বলতে পারি না। তবে গানটি আমি শুনেছিলাম। সুরটা খুব সুন্দর। আর ঘুমের আমেজে গানটা বেশ ভাল লেগেছিল। সকালে যথাসময়ে ঘুম ভাঙলো। গুন্ গুন্ করে ভোরবেলার শোনা গানটা গাইতে গাইতে খগেনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁরে, রাত্রে যে সেন্টারটা ধরলি ওটা কোথাকার সেন্টার?' খগেন এই কথা শুনে ভয়ে ভয়ে বলল, "ওটা দিল্লী থেকে প্রচারিত বহির্বিভাগীয় অনুষ্ঠান।" শুনে আমি বললাম, "ও তাই নাকি! বেশ গানটা কিন্তু। কে গাইছিল? রাত তখন কটা? আর তুই এত রাত পর্যন্ত কী করছিলি?" আমার কথা বলার ধরণ দেখে ও বুঝলো ভয়ের কিছু নেই। তাই ও বলল, "রাত কোথায় তখন? তখন তো ভোর সওয়া পাঁচটা। কিন্তু তুমি শুনতে পেয়েছ? আমি তো খুব আস্তে আস্তে চালিয়েছিলাম।"

'কিন্তু সেদিনকার ঐ গানটা আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছিলাম না। শেষদিকে তো বিরক্ত হয়ে উঠলাম ঐ গানের গুঁতোয়। বাড়ী ফিরে খগেনকে খুব একচোট্ ধম্‌কা ধম্‌কি করলাম। "খবরদার আর কোনদিন যদি আমার রেডিওতে হাত দিস তো তোর একদিন কি আমারই একদিন।"

'আমার কথা শুনে ও বেশ ঘাবড়ে গেল। যে মানুষটা সকাল বেলা গান গাইতে গাইতে কতো কথা জিজ্ঞেস করলো বিকেলেই তার অন্য মূর্তি! ব্যাপারটা কী!.....

'কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না গানটা কেন সারাটা দিন আমার পেছনে Gun নিয়ে তাড়া করে বেড়ালো! ও গান আমি আগে আর শুনিনি, কে গেয়েছে তা'ও জানি না। রাত্রে শুয়ে শুয়ে এ'কথা সেকথা ভাবছি। পাশের বাড়ীতে নৃপেন কর, আমার সহপাঠী পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করছে। ছেলেটা বেশ ব্রিলিয়েণ্ট, তবে একেবারে গাধার মতো খাটতে পারে। ব্রিলিয়েন্ট যখন হয়েছিস তবে আর এত পরিশ্রমের দরকারটা কি?.....

'.....চিন্তা করতে করতে একটা আইডিয়া মাথায় এসে গেল, সবাই বলে ভোরে উঠে পড়লে নাকি অনেক কাজ হয়। যা সারাদিন খেটেও হয় না। কিন্তু কেন? এর কারণ বুঝতে গেলে বুঝতে হবে আমাদের ঘুমের প্রয়োজনীয়তা কি। ঘুম হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের বিশ্রাম, ঘুম না থাকলে আমরা মস্তিষ্কের এত কাজ করতে পারতাম না। মানে, মাথাকে এত বিভিন্নভাবে খাটাতে পারতাম না। তাই ঘুম আমাদের দরকার। আবার আমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি। তাই যদি হয়, তবে দেখা যাচ্ছে ঘুমের মধ্যেও আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করছে। তবে আর বিশ্রাম হল কোথায়? বুঝলি কি না?'—আমার দিকে প্রশ্নটিকে ছুঁড়ে দিয়ে নাড়ুদা একটু থামলেন।

আমি বললাম,—'না, তা' ঠিক নয়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে আমাদের অবচেতন মন। অবচেতন মনের খুব একটা বিশ্রামের দরকার হয় না। তাই মন যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন আমাদের অবচেতন মন ঠিক কাজ করে চলে।'

—'হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেদিন ভোরবেলা আমার অবচেতন মনই কাজ করেছিল।

'এ'থেকেই বুঝতে পারলাম সচেতন মনের চাইতে অবচেতন মনে যদি কোনও কথা ঢোকানো যায় তবে তার স্থায়িত্ব হয় অনেক বেশী, তার হাতেনাতে প্রমাণ পেয়েছিলাম ঐ গানের গুঁতো থেকেই। অবশেষে একটা সহজ পঠন পদ্ধতি চালু করতে হবে, এই প্রপোজাল্ নিয়ে সেদিনকার মতো নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিলাম।

'পরদিন সকালে দোকানে গিয়ে একটা ইয়ার-ফোন, একটা ছোট্ট মাইক্রোফোন আর কিছু তার কিনে নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু ওসব জিনিষের সঙ্গে পড়াশুনার কি সম্পর্ক?' আমি তাঁকে বাধা দিয়ে প্রশ্ন করলাম।

নাড়ুদা উত্তরে জানালেন,—'হ্যাঁ, ঐ জিনিসগুলোই আমাকে সারাজীবন পড়িয়ে এসেছে। শোন্, সেই কথাই বলছি।.....ঐসব যন্ত্রপাতি এনে জোড়াতালি ইত্যাদি যেখানে যা দরকার সব করে খাড়া করলাম আমার 'লার্নিং এইড' যন্ত্রটিকে। আর খগেনকে বলে রাখলাম, তুই তো রোজ ভোরে উঠিস, তাই কাল থেকে উঠেই রেডিওটা চালিয়ে দিবি। আমার কথা শুনে খগেন আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমি তাকে এক ধমক দিয়ে বললাম, 'কি রে; কথাটা কানে গেল? চালাবি তো? তবে হ্যাঁ, তোকে আর খুঁজে পেতে সেণ্টার ধরতে হবে না, শুধু সুইচ্‌টা টিপে দিলেই চলবে। বুঝলি!' ও মাথা নেড়ে জানাল সুইচটা যে টিপতে হবে সেটুকুই শুধু বুঝেছে। তাই আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, ঐ সুইচ্ টিপলেই চলবে। এর চাইতে বেশী বোঝার তোর আর দরকার নেই।

'সেই মতো কাজ চলল। আর আমি সাফল্যের সঙ্গে ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজার দিকে এগিয়ে চললাম। অবশেষে তা'ও পার হয়ে চলে এলাম।'—এই বলে নাড়ুদা আমার-দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। অর্থাৎ কতটুকু মাথায় ঢুকলো তাই জানতে চান।

—'মাথায় ঠিক ঢুকলো না নাড়ুদা।' আমি মাথা চুলকাতে চুলকাতে জানালাম।

—'কেন, এর মধ্যে না বোঝার কি এমন আছে? একেবারে মামুলি ব্যাপার। এটুকু যদি না বুঝিস তবে বোঝা যাচ্ছে তোদের দিয়ে দেশের কোনও উপকার হবে না। অথচ ওটা যখন আমি আবিষ্কার করলাম তখন আমার বয়স তোদের অর্ধেকের চাইতেও কম ছিল।'

—'না, মানে-ইয়ে আপনার ঐ মাইক্রোফোনটোন দিয়ে কী জানি ওটার নাম রিডিং-এইড্ নাকি—'আমি আম্‌তা আম্‌তা করে বললাম।

—'লার্নিং এইড। তা' কি হয়েছে? লার্নিং এইড মানে যা শিখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মাস্টার মশাই।'

—'তা'তো বুঝেছি। কিন্তু ওটা কী করে কি করলেন সেটা'—

—'সহজ ব্যাপার। অতি সহজ। ঐসব যন্ত্রপাতি এনে আমার রেডিওটাকে একটু অদল বদল করে ফেললাম। রেডিওর ডিটেক্টর ষ্টেজ্‌টা বাদ দিয়ে দিলাম। শুধু মাত্র এম্পলিফায়িং ষ্টেজটা রেখে বানালাম একটা এম্পলিফায়ার। ওটার ইয়ারফোনটা রাখলাম আমার বালিসের নীচে আর মাইক্রোফোনটাকে নৃপেন করের পড়ার টেবিলের এমন এক জায়গায় রাখলাম যার ফলে ওর চোখে না পড়ে অথচ আমার কাজ ঠিক হয়। নৃপেন ভোরবেলা উঠে পড়তে বসতো আর এদিকে খগেন চালিয়ে দিত রেডিওটা, মানে ঐ এম্পলিফায়ারটা। নৃপেনের সব কথা আমি চুরি করে শিখে ফেলতাম। ঘুমও হতো পড়াও হতো। এক ঢিলে দুপাখী। মনের বিশ্রাম আর অবচেতন মনের পরীক্ষার পড়া তৈরী, দুটোই একাধারে চলতো।' বলতে বলতে নাড়ুদা উঠলেন। 'আর এই ভাবেই একটা একটা সিঁড়ি পার হয়ে এলাম।' এই বলে নাড়ুদা একটা একটা করে সিঁড়ি পার হয়ে রাস্তায় গিয়ে নামলেন।

আমরা পূর্ণমানব নই……পৃথিবী আমাদের ঘর নয়……
তবুও ভালবেসেছিলাম তাকে…কিন্তু কি যে হয়ে গেল…

আমি মানুষ নই

শ্রীহর্ষ মল্লিক

বুঝতে পারি না আমি।

বুঝি না, কেন আমার মধ্যে এই অসামঞ্জস্য, কেন মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব। সবাই যা সাধারণ বলে ভাবছে, আমিই শুধু তাকে মনে করছি অসাধারণ!

পৃথিবীর এত কাছে থেকেও কেন আমি পৃথিবীর একজন হতে পারি না? আমি আবাল্য শুনছি পৃথিবীর গল্প—তাদের অধিবাসী-দের গল্প—তাদের সুন্দর সুন্দর ছবি—কত বিচিত্র—

তবে কি শুধু এই জন্যই আমি 'অআ'-র অধিবাসী হয়েও পৃথিবীকে ভালবাসি!

পৃথিবী।

কী সুন্দর নামটা। আর আমাদের গ্রহের নাম 'অআ'—মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় নামটা বদলে দিই আমাদের গ্রহের।

তীব্র একটা আবেগ ছিল আমার মনে। কেন পৃথিবীর এত কাছে থেকেও পূর্ণ মানব হয়ে উঠব না!

না, আমরা পূর্ণমানব নই। আমি পৃথিবীর প্রাণীর চেহারা দেখেছি। তারা দেখতে আমাদেরই মত, তবু যেন কোথায় একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে,—যা ঠিক ধরতে পারি না।

কিন্তু আর কেউ আমার মত এ'বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় কি?

... ...

আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচটি মেয়ে। প্রত্যেকেরই পূর্ণ যৌবন। তারা আমায় দেখে হাসাহাসি করছে। গা-ঢলাঢলি করছে।

ওদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যাই আমি। অনেকবারই দেখেছি,—ওদের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করা যায়, গল্পগুজব করা যায়, কিন্তু—

তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। ওছাড়া ওরা আর কিছুই বোঝে না। ওরা যে কী তাও বুঝি না আমি। অথচ—

'ভাবছ কি গো বসে বসে?' একজন বলল।

'দেখ না, 'অআ'র নাবিক ফিরে এল এইমাত্র!' বলল আরেকজন।

লাফিয়ে উঠলাম আমি। 'অআ'র নাবিক—একমাত্র এই লোকটাই অআর্ণবের কাছ হতে পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য করবার অনুমতি পেয়েছে। আমি ওকে চিনি ভাল করেই।

অবশ্য আমার সঙ্গে ওর একটা আলাদা সম্পর্ক আছে। একেক সময়ে আমার মনে হয় ও যদি না থাকতো তবে আমি বোধহয় বাঁচতেই পারতাম না এখানে!

এতবড় রাজ্যে তাই তো আমি ওকেই সবচেয়ে ভালবাসি! আগের বারে যখন 'অআ'র নাবিক ফিরে এসেছিল পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য শেষ করে, তখন আমার জন্য এনেছিল তিনটে ছবি। প্রথমটা ছিল ঊর্মিমুখর সাগরের। ছবির নাম আক্রোশ। পরের ছবিটার নাম চিরপ্রতীক্ষা। ছবিটা ছিল একটা সূর্যমুখী গাছকে বেষ্টন করে উঠেছে এক মাধবীলতা। সূর্যমুখী আর মাধবীলতা তাকিয়ে রয়েছে মুখোমুখি। আর তৃতীয় ছবিটার কথা বলব না আমি।

'অআ'র নাবিক বলেছিল, পৃথিবী থেকে সে যত জিনিষ এনেছে, তার মধ্যে মূল্যবান হল দ্বিতীয় ছবিটা।

ছবিটা আমারও ভাল লেগেছিল। ওটা দেখতে দেখতে আমার মনের ভেতর ওলোট পালোট সুরু হয়ে গেছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমিই আমিই বুঝি সূর্যমুখী। আর ঐ মাধবীলতাটা……

… … … …

'শোন, তোমার জন্য বই এনেছি চারখানা। একটা কবিতার বইও আছে তার মধ্যে।'

'অআ'র নাবিক বলল আমাকে অতি চুপে চুপে। শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম।

বইয়ের ওপরের ছবিটা ছিল—সাগর বেলার ঝাউবনে হাওয়ার মাতন লেগেছে। সমস্ত ঝাউবন দুলছে এলোমেলো। একটা সাগর পাখী সবার অলক্ষ্যে ঝাউয়ের কানে কানে কী যেন গোপন কথা বলছে।

আমার চোখ যেন তখন আনন্দে কথা বলছিল। আমাকে লক্ষ্য করল অআ'র নাবিক।

কিন্তু ওর কোন কথা না শুনে আমি পালিয়ে এসেছিলাম ঢেউ খেলানো শস্য ক্ষেতের ধারে। এ'গ্রহে সমুদ্র নেই। থাকলে, ঐ মুহূর্তে আমার ইচ্ছা হল ঢেউয়ের মাথায় চড়ে বসতে।

'ঝাউবনের গানের' প্রতিটি কবিতাই আমার মনে দোল দিয়েছিল। আমি ব্যাকুল হয়ে খুঁজছিলাম মাধবীলতাকে। কিন্তু পাচ্ছিলাম না। তাই শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম বইয়ের মলাটের দিকেঃ বোধহয় শুনতে চেষ্টা করলাম সাগর-পাখীর গোপন কথা!

... ...

'আমি থাকতে চাই না। 'অআ'-র নাবিক তুমি বাঁচাও আমাকে। আমি মাধবীলতাকে চাই। আমি ভালবাসতে চাই। আমি শুনতে পেয়েছি সাগর-পাখির গোপন কথা ঝাউগাছের সঙ্গে।'

থমকে দাঁড়িয়ে রইল 'অআ'-র নাবিক আমার মুখের সামনে—কি বলবে কিছু বুঝতে পারল না।.....তারপর তার মুখে ফুটে উঠল প্রবীণের হাসি। মুখটাকে গম্ভীর করলঃ শুধু তুমিই ব্যাকুল হচ্ছ। তোমার বয়সী কত ছেলে তো আছে এখানে, কই তারা তো তোমার মত কথা বলে না! তোমার বয়সী কত মেয়ে তো আছে এখানে, কই তারা তো এ'ধরণের কথা চিন্তা করে না কখনও। তবে কেন তুমি ভাবছ এ'সব কথা?' ক্ষণেক থামল 'অআ'-র নাবিকঃ 'বল, কেন তুমি এদের ব্যতিক্রম?'

'ব্যতিক্রম? আমি ব্যতিক্রম? আমিই স্বাভাবিক। এ'গ্রহ আমার ভাল লাগে না। এখানে ভালবাসা নেই, প্রেম নেই। আমি—' কাঁপতে লাগল আমার কণ্ঠস্বরঃ 'আমি পৃথিবীতে যেতে চাই। যে পৃথিবীতে ভালবাসা আছে—প্রেম আছে—সবুজ বসন্ত আছে—উত্তাল সাগর আছে.....'

'থামো।' বাধা দিল আমার 'অআ'-র নাবিকঃ 'আমি জানি পৃথিবীর বই পড়ে পড়েই তোমার আজ এ'অবস্থা। যত দোষ আমারই। তুমি কি জানো, কি এর পরিণাম? কেন, তুমি এ'গ্রহের কাউকে ভালবাসতে পারো না?'

'এরা পাষাণ তাই! এদের হৃদয় নেই। এদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা বা গল্প-গুজবই করা যায় শুধু।' বললাম আমি।

বুঝি একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ওর। আর আমি ক্রমেই অধীর হয়ে উঠছিলাম ওর এই নীরবতায়। অনেকক্ষণ পরে বলল 'অআ'র নাবিক: 'তুমি সত্যিই ভালবাসো না আমাদের?'

'না।'

'পৃথিবীকে তুমি ভালবাসতে পারবে বলে মনে কর?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু অআর্ণব?'

'আমি তাঁকে মানতে চাই না।'

আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারল 'অআ'-র নাবিক। বলল: 'আগামী বাণিজ্যযাত্রায় আমি পৃথিবীকে এক নতুন জিনিষ উপহার দেব!'

... ...

সন্ধ্যের মুখে নামলাম পৃথিবীতে।

বোধহয় আমার ভাগ্যপরীক্ষা করবার জন্যই 'অআ'-র নাবিক আমাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছিল। তাকে আর খুঁজে পাইনি আমি।

এই পৃথিবী!

আমার স্বপ্নের ছবি!

চারিদিকে জনসমুদ্র। প্রথম কয়েক মুহূর্ত আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। কিন্তু তারপরই বেশ লাগল আমার। জনতার স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে এলাম যেখানে, সে জায়গাটা বোধ হয় শহরের কেন্দ্রস্থল। বেশ সাজানো ছবির মতন।

একটা কেন্দ্র হতে পাঁচটা রাস্তা বেরিয়েছে পাঁচদিকে। গাড়ী আর মানুষ চলছে একসঙ্গে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি।

চারিদিকে সিনেমা-থিয়েটার হল। রংবেরংয়ের ছবি। একটা হলে হচ্ছে 'যুদ্ধের পরে।' ছবিটার দিকে তাকিয়েই শিউরে উঠলাম আমি। আমার ঠিক পিঠনেই আর একটা হলে হচ্ছিল 'ঝাউ-বনের গান।'

আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। খুব ইচ্ছা হল, ঐ হলের ভেতর ঢুকে পড়ি। দেখি, কী হচ্ছে ভেতরে।

দূরের উজ্জ্বল নিয়ন আলোটা জ্বলছে আর নিবছে। যেন হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে।

'ভাগ্য পরীক্ষা করুন।'

কে যেন চেঁচিয়ে উঠল মোটা গলায়। চোখ ফিরিয়ে দেখি, একটা মাইক থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে। আর, কখন যে হাঁটতে হাঁটতে আমি এক বিরাট সামিয়ানার সামনে এসে পড়েছি, তা বুঝতে পারিনি নিজেই। বুঝলাম, আওয়াজটা আসছে ওরই ভেতর থেকে।

সবাই ঢুকছে, আমিও ঢুকলাম। তাঁবুর ভেতরে ঢোকা মাত্র সবাই তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

লাউডস্পীকারটা তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে 'এক মিনিটে আপনার ভাগ্য ফিরে যাবে।'

অবাক হয়ে গেলাম। মাত্র এক মিনিটেই আমি আমার ভাগ্যটাকে পরিবর্তন করতে পারি! এত ভাগ্যবান আমি!

থলথলে ভুঁড়ি-ওলা লোকটা এগিয়ে এল আমার দিকে: 'করুন না একবার লাক ট্রাই।'

'কি করতে হবে আমায়?'

লোকটি এবার সবিস্ময়ে তাকায় আমার দিকে: 'মনে হচ্ছে আপনি এখানে নতুন? মানে বোধ হয় এই পৃথিবীরই মানুষ নন!'

আমি ভেতরে ভেতরে চমকালাম। বলে ফেললাম: 'কি করে বুঝলেন?'

'আপনার স্যুট দেখে। ঠিক ওরকম জামা আমাদের এখানে কেউ পরে না। কিন্তু আপনি যে জন্য এখানে এসেছেন, তা তো এ' মুহূর্তেই পেয়ে যেতে পারেন!'

'কেমন করে?' বলেই আমি চোখ ফেরাই ডান দিকে।

'এই বন্দুকটা দিয়ে ঐ-ঐখানে টিপ করে মারুন। ঠিক এই পয়েন্টটায় বিঁধতে পারলেই', বাঁ চোখটা দিয়ে একটা বিশ্রী ভঙ্গি করল লোকটা, 'এই মেয়েটা হয়ে যাবে আপনার।'

শুনতে শুনতেই দমবন্ধ হয়ে আসছিল। 'আচ্ছা, এগুলো কি সত্যিকারের বুলেট?'

মুহূর্তে কঠিন হল লোকটার মুখঃ 'তার মানে? বাইরে বিজ্ঞাপন দেখেন নি? সত্যিকারের বুলেট! ওসব বুজরুকি চলবে না এখানে। আপনাদের দেশে হয়তো চলতে পারে, কিন্তু এখানে ওসব করলেই জেল।' বলে লোকটি ঠাণ্ডা হয়।

'ধরুন যদি, আমার হাত ফসকে যায়? কোন একটা লোক মরে যায়?'

'যাবে।' নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর লোকটির, 'সে তো আপনার দেখবার কথা নয়। আপনার ভাগ্য আপনি ফিরিয়ে নেবেন তো নিন। মানুষ মরে তো মরবে!' তাই বলে—'

'মানুষ মরে তো মরবে? ঐ কথাটারই পুনরুক্তি করি আমি, 'মানুষের এত কম দাম এখানে?'

লোকটা চুপ করে রইল। পরে বলল—'নিন, ধরুন বন্দুকটা। কার্তুজটা ভরে নিয়ে ঐ ডানদিকে চলে যান। যে মেয়েটাকে ইচ্ছা, তার নম্বরটা এখানে লিখে রাখুন।'

'না।' মুখ দিয়ে বার হল আমার।

'কি না! বুঝতে পারছেন না! জিততে পারলেই একেবারে একটা মেয়ে—' জিভটা কেমন বিশ্রীভাবে চাটল লোকটি।

'থামুন!' গর্জে উঠি আমি চাপা স্বরে: 'ওসব গুলা-গোলা ভাল লাগে না আমার!'

আমার কথা শেষ হবার আগেই শুনলাম একদল মেয়ের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের হাসি। কি উৎকট বেশবাস ওদের! মনটা ঘৃণায় ভরে উঠল।

'ভাল না লাগলে তো উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে আপনার!' আমি চুপ করে আছি দেখে বলে লোকটি: 'আপনি ভালবাসা পেতে এসেছেন তো?'

আমার বুকে যেন হাতুড়ি পড়ে। ঘন ঘন নিশ্বাস নিই। তারপর থাকতে না পেরে বলে উঠি: 'গুলীর বদলে ভালবাসা? দরকার নেই আমার অমন ভালবাসায়।'

বলেই, তাকে দ্বিতীয় কোন কথা বলবার অবসর না দিয়েই আমি তাঁবুর বাইরে চলে আসি।

... ...

'ও মশাই শুনছেন!'

হতাশ হয়ে পড়ছিলাম। ...এতদিন ধরে পৃথিবীকে ভালবাসলাম—এই পৃথিবীর মানুষদের ভালবাসলাম। ...ভাবছিলাম ফিরে যাবো!

সহসা চমকে উঠলাম।

বেঁটে খাটো লোকটি। সুদর্শন মোটেই নয়, তবু কেমন যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে ওর। আমি ফিরে তাকালাম ওর দিকে: 'কিছু বলছেন নাকি?'

'আপনি সত্যিই ফিরে যাবেন?'

লোকটা কি মন বুঝতে পারে নাকি? না বলে আমি পারি না: 'আপনি কি চেনেন আমাকে? আমি এসেছিলাম—'

'ভালবাসা পেতে। জানি, কিন্তু ফিরে গেলেন কেন?' বলল লোকটি।

'দেখলাম, পৃথিবীর সম্বন্ধে এখনও আমি পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারিনি। যখন পারব, তখন আবার আসব।'

'আপনি ভুল করেছেন। ভালবাসা খুব সহজেই পাওয়া যায় এখানে। শুধু চোখ-কান সজাগ রাখতে হয়। আপনার সব কথাই শুনেছি আমি।'

'কিন্তু প্রেম ভালবাসার নামে ঐসব গুলী-গোলা-যুদ্ধ আমার ভাল লাগে না। বরং আপনি অন্য কোন বিষয়ে কথা বলুন।'

'ভালবাসার আড়ালে যুদ্ধ কোথায় নেই বলতে পারেন? গোটা পৃথিবী জুড়েই তো এই! এই যে দেখুন, সেদিন রব উঠল "হিন্দী চীনী ভাই ভাই!" কিন্তু তার পরিণতি দেখুন। সেই চীনই তো সেবার শীতে কেমন হঠাৎ আক্রমণ করে বসল আমাদের।'

লোকটির কথার ধরণ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। বললাম: 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।'

'খুব পারবেন। আর একটু বললেই হবে,—যেমন ধরুন পাকিস্তানের এই যুদ্ধটা। অবশ্য এটা আমরা জানতাম বরাবরই—'

'আপনি থামবেন? পৃথিবীতে কি যুদ্ধ ছাড়া কোন কথা নেই? এখানে দিনরাত্রি কি শুধু যুদ্ধই হয়?' আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি।

'তাছাড়া কী! এই যে এত বড় শহর, এখানেই কি কম যুদ্ধ করে বেঁচে আছি আমরা? খাদ্য-দ্রব্যের যুদ্ধ, বাসস্থানের যুদ্ধ, জীবনে উন্নতি করার যুদ্ধ—'

মনে মনে 'অআ'র নাবিকের 'পরে অতি রাগ হল আমার। পৃথিবীতে যে দিনরাত্রি যুদ্ধ লেগে আছে, এ'কথা সে বলেনি কেন আমায়? প্রেম ভালবাসা কোথায় এখানে?

'নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ।'

পৃথিবীতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাসটা রপ্ত করে নিয়েছিলাম। তাই সসম্মানে ঐ লোকটিকে প্রত্যাখ্যান করে আমি অন্য পথে পা বাড়াই।

'না, না যাবেন না। প্রেম ভালবাসা সত্যিই মেলে এখানে। আর মেলে সেটা আপনাদের মত লোকদের জন্যই।'

যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াই আমি। এ' মুহূর্তে ঐ বেঁটে লোকটার সঙ্গে অআ'-র নায়িকের যেন একটু সাদৃশ্য দেখতে পেলাম।

'মিনিট পাঁচেক হেঁটে গিয়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়ুন একটা চওড়া রাস্তায়। তারপরেই চোখে পড়বে 'বিনিময়' অফিস। সেখানে গিয়ে আমার নাম করবেন। ওহো, আমার নামটাই বলা হয়নি। আমার নাম হল "—", আমি ওদের ট্রাভেলিং এজেন্ট।'

... ...

খুঁজতে হল না। নিয়নের লেখাটা দূর হতেই আমাকে আকর্ষণ করতে লাগল। উর্ধশ্বাসে ছুটে এলাম আমি। নিয়নের লেখাটা জ্বলছে আর নিভছেঃ 'দিবারাত্র খোলা থাকে। একদিনেই একসপ্তা! পরীক্ষা প্রার্থনীয়!'

ঢুকেই পড়লাম।

তবে একটু যে অবাক হয়ে যাইনি তা' নয়।...বেশ সাজানো গোছানো ঘরটি। সামনেই একটি চকচকে ডেস্ক—মুখ দেখা যায় ইচ্ছা করলে। তার সামনে খানকয়েক চেয়ার সাজানো। তার ওপারে বসে আছেন একটি সৌম্যদর্শন ব্যক্তি। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা। ডেস্কের এদিক থেকে আমি শুধু তার মুখটা দেখতে পেলাম।

'আসুন আসুন।' বলল সেই ম্যানেজার জাতীয় লোকটিঃ 'বহুদূর থেকে তো আসছেন আপনি। এই পৃথিবী কেমন লাগল আপনার?'

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলাম আমি—এদের কাণ্ডকারখানা দেখে। এরা বোধহয় প্রত্যেকেই জানে হাত গুণতে!

'কি করে বুঝলেন যে আমি এ'গ্রহের বাসিন্দা নই?'

'সে কি আর আমাদের বলতে হয়? আপনাকে দেখেই বুঝতে

পেরেছি। তবে আপনি ঠকবেন না। ভাল জিনিষই দেব আপনাকে।'

আমি আর কথা বলতে পারলাম না। চুপ করে শুনতে লাগলাম তার কথা—'বুঝলেন মশাই, আমাদের এই ল্যভ কর্পোরেশনটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রেম-বিনিময় কেন্দ্র। সবচেয়ে পুরোনো-ও। সবসেরা জিনিষই রাখি আমরা। আপনার ভাগ্য বলতে হবে যে, আপনি একবারে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। নাকি—'

'না, আমি এর আগে দু' জায়গায় ঠকেছি।' তখন আমাকে বলতে হল বিনিময়-এর সেই ট্রাভেলিং এজেন্টের কথা।

'তবু ভাল যে বাজে লোকের পাল্লায় পড়েননি। হ্যাঁ, আপনার দেরী করা ঠিক নয়। ভালবাসা পাবার জন্য আপনি বহু দূর থেকে আসছেন। আপনার সত্যিই প্রেমিক হবার যোগ্যতা আছে।'

একটা বোতাম টিপলেন ম্যানেজার।

'দেখুন, ব্যাপারটা আমি ঠিক—'

'হ্যাঁ, বলুন—'

'মানে, ঠিক বুঝতে পারছি না।' হতভম্ব হয়ে যাই আমি। 'আমার মনে হচ্ছে আমি ভুল জায়গায় এসে পড়েছি। 'অআ' গ্রহ থেকে এই এতদূরের পৃথিবী গ্রহে এলাম আমি শুধু মানে, আমার মনে হয়—প্রকৃত ভালবাসা বিক্রী হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস! তাই তো? আর তা' যদি বিক্রীই হয় তবে নিশ্চয়ই তা' খাঁটি প্রেম নয়?'

'সে তো নিশ্চয়! সে তো নিশ্চয়।' ব্যবসায়ী সুলভ ভঙ্গীতে হাসল ম্যানেজারটি, 'আসল কথা তো ওটাই। ব্যাপার কি জানেন—দৈহিক সুখভোগ, সে তো যে কোন গ্রহেই যে কোন লোক যে কোন বস্তুর বিনিময়েই পেতে পারে, কিন্তু'—এক বিশেষ ভঙ্গীতে

আমার দিকে তাকায় লোকটিঃ 'খাঁটি জিনিষ, মানে প্রকৃত প্রেম, সে শুধু দিতে পারি আমরাই। কেন, আমাদের এজেন্ট এ'কথা বলেনি আপনাকে?'

'বলেছে বোধহয়।'

'তবে? না না, আপনি ওধরনের কথা ভাববেন না। একমাত্র যাকে আপনি ভালবাসেন তার সম্বন্ধেই এ'ধরনের কথা বলতে পারেন! আর যে আপনাকে ভালবাসবে, সে-ই বলবে আপনাকে এ'ধরনের কথা।'

'তাহলে সেটা নিশ্চয় প্রকৃত স্বর্গীয় প্রেম নয়?'

'নয় কেন? এতে যদি কোন ভেজাল দেওয়াই থাকত, তবে তো বিজ্ঞাপনেই তার উল্লেখ করতাম।' গম্ভীর হয় ম্যানেজারঃ 'না, ও ধরনের ফাঁকিবাজী হয় না এখানে!'

মনে হল, বেশ একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ম্যানেজারঃ 'না না, ওরকম ভুল করবেন না। এক কথা বলে আরেক জিনিষ দেবো না আপনাকে। দেখবেন, ঠিক সময়ে ঠিক ভাবটিই উদয় হবে আপনার মনে। ঠিক যেমটি লিখে গেছেন কবিরা আর সাহিত্যিকরা যুগ যুগ ধরে তাদের কাব্যে-উপন্যাসে। অথচ দেখুন সেই মহামূল্য জিনিষটা আপনি পাচ্ছেন কত সুবিধায়! যাকে বলে কনডেন্সড ফর্মে, অল্প সময়ে আর অল্প দামে!'

কী বলে এরা!

অল্প সময়ে, অল্প খরচে, সুবিধা দরে—এ কি ব্যাপার! 'আমি তো ভেবেছিলাম প্রেম ভালবাসা হবে আরও স্বাভাবিক আরও স্বতঃস্ফূর্ত।'

'হ্যাঁ, সেই একই কথা হোল। আমাদের বৈজ্ঞানিকরা দীর্ঘ-দিন ধরে গবেষণা করবার পরই তো এত সুবিধা পেয়েছেন আপনারা। না, তো ভেবে দেখুন, প্রেমের মত মহার্ঘ বস্তু পেতে হলে—'

বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিলাম আমি। আমার মুখ দিয়ে বার হল, 'মনে হচ্ছে এটা যেন একটা সিনেমা!'

'উহুঁ, আপনি ভুল করছেন। আপনি ভাবছেন আমরা জোর করে আপনার ঘাড়ে কিছু চাপিয়ে দিচ্ছি। মানে, এমন একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো, যে হয়তো আপনার সঙ্গে শুধু ভালবাসার অভিনয়ই করবে। এই তো?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'এইখানেই ভুল করেছেন আপনি। ব্যাপারটা ঠিক তা' নয়। এতে হয়কি, মানসিক দিক দিয়ে যে কোন পক্ষেরই চরম ক্ষতি হতে পারে!'

'তবে, কি করে তা' সম্ভব?'

'মনস্তত্ত্ব আর বিজ্ঞান যা' বলে তা' সম্ভব।'

হতাশা আর বিরক্তিতে আমার মন ভরে ছিল। কথা না বাড়িয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

'একেবারে চলে যাবেন না, কিছু বলতে দিন আমাকে।' আবার ব্যবসায়ীসুলভ কণ্ঠস্বর শুনি ম্যানেজারের: 'আপনি অন্য গ্রহ থেকে এসেছেন প্রকৃত প্রেমের সন্ধানে। কিন্তু তাই বলে আপনি ফিরে যাবেন?'

'উপায় নেই তা' ছাড়া।'

'দাঁড়ান এক মুহূর্ত। খদ্দের সন্তুষ্ট না হলে এক পয়সাও নিই না আমরা। এতে কোম্পানীর বদনাম হয়।'

'তা' জানি।'

'তাছাড়া'—ক্ষণেক স্তব্ধ হয় লোকটি: 'এযুগের প্রেমবিশারদদের মতে, আমরা যে প্রেম সাপ্লাই করি, তাই হল খাঁটি—সেণ্ট পার্সেণ্ট খাঁটি। মানে, গভীর, অনুরাগদীপ্ত, স্বতঃস্ফূর্ত, নিষ্কাম, পবিত্র আর যেটা তা হল আমাদের এ'প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব—অর্থাৎ ল্যভ এ্যাট ফার্স্ট সাইট, মানে প্রথম দর্শনেই প্রেম—এই আর কি! হ্যাঁ, আপনার তাই হবে!'

আশার আলো দেখতে পাই আমি।

পরমুহূর্তেই বোতাম টিপল লোকটি। পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে গেল। আত্মপ্রকাশ করল এক তন্বী রূপসী।

'ভ্রমর কালো তার মাথার চুল। সদাই তার চোখ ছলো ছলো।'

আমি নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। 'ইনি হলেন কুমারী '—', আর ইনি হলেন 'অঅ' গ্রহের কুমার '—'।' ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিল আমাদের। কিন্তু তার কোন কথাই কানে গেল না আমার।

…দেখলাম ও তাকিয়ে আছে আমার দিকে অপলক নেত্রে। হয়তো কিছু বলবে, ঠোঁটটাও কাঁপল একটু। কিন্তু কিছু কথা বেরোল না। আমিও রুদ্ধবাক্ হয়ে গেছি। তার চোখের ভাষাও যেন আমি পড়তে পারলাম। আর সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম আমি তার প্রেমে পড়ে গেছি।

পরিপূর্ণ সম্মোহিত হয়ে গেলাম আমরা। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে আমরা পরস্পরকে আকর্ষণ করলাম। আমি ওর হাত ধরে নিয়ে এলাম বাইরে।

একটা ছোট জেট বিমান অপেক্ষা করছিল বাইরে—আমাদের জন্যে। আমরা চড়লাম তাতে।

… … … …

ওর মাথাটা আমার কাঁধে। ওর চুলের গন্ধ আমার স্নায়ুকে উত্তেজিত করছিল।…কিন্তু পরমুহূর্তেই এসে গেলাম আমরা সাগর পাহাড়ে ঘেরা এক অজানা রাজ্যে।

ছোট্ট একটি মাটির কুটির। একধার দিয়ে উঠেছে এক চামেলী লতা। পাশে একটি মাধবীকুঞ্জ। পিছনে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে আবছা পাহাড়। পাহাড়ের ওপ্রান্ত হতে তখন রক্ত রাঙা সূর্য উঁকি মারছে।

আমরা দু'জনে বসলাম সেই কুটিরের সামনের ছোট্ট বারান্দায়।

আমাদের সামনে দিগন্ত রেখার মত ব্যপ্ত ঝাউ বন। তারই ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দূরে অসীম জলরাশি। কি বিচিত্র সেই ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ!

ভোরের সূর্যের প্রথম আলো এসে পড়ল সাগরের জলে। সে রাঙার ছটা যেন ওর মুখেও।

কি অপরূপ তখন দেখাচ্ছিল ওকে। মনে হল এত সুখ জীবনে আমি পাইনি কখনও। 'অআ'র নাবিকের কথা তখন ভুলেও আমার মনে হয়নি।

কোথা দিয়ে যে কেটে গেল দিন, তা বুঝতেই পারলাম না।

দ্বিপ্রহরে গেলাম আমরা সাগর সৈকতে। আমি তাকে আবৃত্তি করে শোনালাম 'ঝাউবনের গান।' ও আমার কবিতায় সুর দিয়ে গান গাইল। আনন্দে অধীয় হয়ে ও আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

সূর্য অস্ত গেল ধীরে ধীরে। সূর্যের শেষ রশ্মিটা বক্রভাবে তার মুখে পড়ল। তখন ওকে আরও সুন্দরী মনে হল আমার। মনে হল, ও যেন এই পৃথিবীর কেউ নয়, ও যেন স্বর্গের দেবী।

সূর্যাস্তের পরে আমরা গান গেয়ে করলাম সন্ধ্যা-বন্দনা। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় তখন ওকে রহস্যময়ী দেখাচ্ছিল। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুতেই ওর দিক হতে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। মনে হল ওকে ছাড়া আমি বুঝি বাঁচতেই পারব না।

গভীর রাত্রে আমরা চলে এলাম ঝাউবনের ধারে বেড়াতে। তারপর সাগরপাখীর গান শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। বুঝতে পারলাম না কি স্বপ্ন তখন দেখেছিলাম। কিন্তু মনে পেলাম প্রচুর আনন্দ আর স্বর্গীয় প্রেমের স্বাদ।

... ...

কিন্তু ভোরে উঠে আমার নিজেকে কেমন যেন অবসাদগ্রস্ত

মনে হল। আমি যেন আমার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেলাম না। মনে হল, আমার জীবনের একদিনের ইতিহাস হঠাৎ যেন আমি ভুলে গেছি। কিছুতেই মনে করতে পারলাম না, গতদিনের কথা।

…দুপুরে এলাম আমরা 'বিনিময়' অফিসে! মুহূর্তের জন্য আমার হাতে একটা আলতো চাপ দিয়ে ও যেন চলে গেল কোথায়। আর খুঁজে পেলাম না!

'স্বর্গীয় প্রেম পেয়েছেন তো?' বলল ম্যানেজার।

'হ্যাঁ।'

'সন্তুষ্ট হয়েছেন আশা করি?'

'খুব। এমন পবিত্র প্রেমের স্বাদ আমি জীবনে পাইনি কোনদিন।' আমি কথা বলছিলাম, কিন্তু আমার চোখ দুটি খুঁজে বেড়াচ্ছিল তাকে 'কিন্তু ও কেন তারপর আমাকে টেনে নিয়ে এল এখানে?'

'সেটা তার সম্মোহনোত্তর প্রতিক্রিয়া।'

'কি বললেন?' বলি আমি।

'আপনার কি মনে হয়? সবাই তো প্রেম চায়, কিন্তু ক'জন তার উচিৎ মূল্য দেয়। দাঁড়ান, বিলটা রেডি করি আপনার।'

'তার দরকার নেই। অবশ্য যা' দেবার তা দেব ঠিকই। কিন্তু ও গেল কোথায়? কি করছেন ওকে নিয়ে আপনারা?' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠি আমি।

'শুনুন। উত্তেজিত হবেন না।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর সেই ম্যানেজারের।

'না, হবো না।' আমি বিদ্রূপ করি ওকেঃ 'ওকে এনে দিন আমার কাছে!'

'অসম্ভব। তা একেবারেই অসম্ভব।'

'তার মানে, আরও বেশী টাকা চান আপনি? নিন ধরুন, কত চাই আপনার? আমি তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেতে

চাই।' ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি আমার মানিব্যাগটা ডেস্কের ওপরে উপুড় করে দিই।

'তুলুন, তুলুন।' ক্ষিপ্ত হল ম্যানেজার: 'খুব নামজাদা কোম্পানী আমাদের। কোনরকম অভদ্রতা করবেন না। বেশী কিছু করলে—'

ততক্ষণে আমি নিজেকে সামলে নিয়েছি। আস্তে আস্তে চেয়ারে বসলাম। একটু পরে মানেজার বলল: 'হঠাৎ ও রকম রেগে উঠলেন কেন? ন্যায্য কথা বলুন, আমিও তার উত্তর দিচ্ছি। বলুন আপনার ট্রাবলটা কি?'

'আমার ট্রাবল?' আমার উত্তেজনা আসছিল, কিন্তু সংযত করলাম নিজেকে: 'সে আমাকে গভীরভাবে ভালবাসে।'

'হতেই পারে।'

'তবে কেন আমাদের বিচ্ছেদ ঘটালেন আপনি?'

'এটা আপনার পক্ষেই ভাল হল। প্রেম পবিত্র, স্বতঃস্ফূর্ত এবং মহার্ঘ্য; মনের উত্তেজনার সমতা রক্ষা করে। দেহের উত্তেজনাকে সংযত করে। কিন্তু খুব বেশীক্ষণ এটা সহ্য করতে পারে না কেউ।'

'আমি পারি। আমাদের প্রেম সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।'

'তা হতে পারে। কিন্তু তাদের উৎপত্তি তো' সেই একই জায়গা থেকে!'

'কী রকম?'

'কেন, আপনি প্রেম উৎপাদক যন্ত্রের কথা শোনেননি?'

'না। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের প্রেমটা স্বাভাবিক!'

'শুনুন। মেয়েদের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্মগুলো আর ছেলেদের মনের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্মগুলো আমরা যান্ত্রিক উপায়ে আয়ত্তে এনেছি। এটা হয়েছে পৃথিবীতে যান্ত্রিক বিপ্লব আসবারও আগে। তখন অবশ্য এর এত উন্নতি হয়নি। ইদানিং বেশ

প্রগ্রেস করেছে। তাই ব্যবসায়িক দিক দিয়ে এখন এতে বেশ লাভও হচ্ছে। সে যাই হোক, কোন ছেলের সাধারণ ধর্মগুলোর সঙ্গে কোন মেয়ের স্বাভাবিক ধর্মগুলোর অন্ততঃ শতকরা পঁচাত্তর ভাগ সাদৃশ্য দেখা গেলেই আমরা বুঝতে পারি, তারা পরস্পরকে ভাল বাসতে পারবে। অবশ্য এ' সবই হবে যান্ত্রিক উপায়ে!'

'তার মানে, ও অন্য লোকের প্রেমেও পড়তে পারে?' উদভ্রান্তের মত বলি আমি!

'তার মানে, ও এখন অন্য লোকের প্রেমে পড়ে গেছে।' সংশোধন করে দেয় ম্যানেজার আমার কথাটি।

'ওঃ!' মাথায় হাত দিতে হয় আমায়ঃ 'এই হরিব্‌ল্‌ কাজ সে করে সে দিনের পর দিন, কেমন করে?'

'কিছু শক্ত নয়। প্রথমে সে একটা চুক্তিপত্রে সই করে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের ল্যাবরেটরীতে। এবং সেখানে তার ব্যক্তিগত মানসিক সত্তাকে লুপ্ত করে আমাদের মানসিক সত্তাকে প্রয়োগ করা হয়। তারপর চুক্তির সময় শেষ হলে সে আবার তার মানসিকতা, ব্যক্তিত্ব সবই ফিরে পায়। এতে তার কোনই ক্ষতি হবে না।' থামল ম্যানেজার বিজয়ী বীরের মত।

'কিন্তু সেটাকে কি প্রকৃত ভালবাসা বলা হবে?' না বলে আমি পারি না।

'কেন না? একেবারে স্বাভাবিক প্রেমের মতই। বিশেষতঃ এটা আবার যান্ত্রিক উপায়ে চালিত। প্রমাণ চান তো, আরেক দিন সময় দিতে পারি আপনাকে।'

মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। রাগে-দুঃখে-হতাশায় কোন কথাই বলতে পারছিলাম না আমি। কয়েক মুহূর্ত চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। তারপর মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করে বলেই ফেলি, শুনুন, আমি ঐ বৈজ্ঞানিক প্রেমের কথা কিছু বুঝি না।

বা তার প্রমাণও পেতে চাই না। আসল কথা হল, আমি ভাল বেসেছি। সেও আমাকে ভালবাসে। আমাকে একবার তার সঙ্গে কথা বলতে দিন। আমি আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

সান্ত্বনা দেবার হাসি ফুটে উঠল লোকটির মুখেঃ 'আসুন, দেখেই যান। তবে ঐ ধরনের কোন মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন বলে মনে হয় না। যদি বিয়ের কনেই পছন্দ করতে চান তো বলুন, সেও সাপ্লাই করি আমরা—একেবারে সেন্ট পার্সেন্ট খাঁটি কুমারী মেয়ে।'

'না, আমি তাকেই চাই। অন্ততঃ তার সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু সেটা যে একেবারেই অসম্ভব!'

'কেন?'

আরেকবার বোতাম টিপল লোকটিঃ 'কেন আপনি বার বার তার কথাই বলছেন? তাকে তো এখন সম্মোহন করা হয়েছে। সে এখন অন্য কোন লোকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছে।'

বোধগম্য হল সমস্ত ব্যাপারটা।

হয়তো সে এখন আমাকে চিনতেও পারবে না। ঠিক তেমন ধারা ছলো ছলো দৃষ্টি দিয়ে সে হয়তো এখন তাকিয়ে আছে অন্য কোন লোকের দিকে। হয়তো এখন তার ঠোঁট কাঁপছে অবরুদ্ধ আবেগে ঠিক আগের মতো। হয়তো প্রথম দর্শনেই কারো প্রেমে পড়ে গেছে!

... ...

কেমন করে যে আমি আবার রাস্তা দিয়ে চলতে সুরু করেছিলাম মনে পড়ে না। মনে হচ্ছিল নানান কথা।

সমস্ত দেহ অবসন্ন। সমস্ত মন অবসাদগ্রস্ত। ইচ্ছা হচ্ছিল সেই মুহূর্তে ফিরে যাই আমার গ্রহে। পৃথিবীর সম্পর্কে সব শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গেল আমার।

আনমনে পথ চলতে চলতে এসে পড়লাম সেই মেলার কাছে। তখনও বন্দুক শুটিং হচ্ছে সেখানে। থলথলে ভুঁড়িওলা লোকটি তখন বললে আমাকে একগাল হেসে : 'লাক ট্রাই করবেন নাকি ?'

'হ্যাঁ করব।' ঢুকে পড়লাম তাঁবুর মধ্যে এই পৃথিবীতে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে।*

* বিদেশী ভাব অবলম্বনে।

ভাল ভাল উপন্যাস পড়ুন.....

হৃদয়ের স্বাক্ষর জগদীশ প্রসাদ দাশ ৪৲

'সুন্দর'—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় :: 'অপূর্ব'—লীলা মজুমদার।

নর্তশির ঊর্মি গ্রেগরী মুখার্জী ৫৲

'মনে হয় চলচ্চিত্র'—আনন্দবাজার :: 'নূতনত্ব আছে'—বসুমতী।

ঝড়ো ফুল সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ৫৲

'উজ্জ্বল, জীবন্ত'—আনন্দবাজার :: 'সংস্কৃতিপূর্ণ'—অমৃত।

ডাকব্যয় স্বতন্ত্র। ভিপিতে বই পেতে হলে ১৲ অগ্রিম পাঠাবেন।

অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্

৯৭-১, সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪

আশ্চর্য !

১। প্রকাশনার স্থান : ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলিকাতা ১৪। ২। প্রকাশনার সময় : মাসিক। ৩। মুদ্রক ও প্রকাশক : অসীম বর্ধন, ভারতীয়, ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলি-১৪। ৪। সম্পাদক : আকাশ সেন, ভারতীয়, ৯৭-১ সারপেনটাইন লেন, কলি-১৪। ৫। স্বত্বাধিকারী : অসীম বর্ধন, অ্যাল্‌ফা-বিটা পাবলিকেশন্‌স্, পোস্টবক্স ২৫৩৯, কলিকাতা ১

অংকে কি না হয়! স্রেফ অংক কষে
বাহুবলীন্দ্র প্রমাণ করে দিলেন চন্দ্রপ্রদক্ষিণকারী
ইংরেজ ডাক্তারের খবরটা ডাহা স্বপ্ন!

চাঁদ এবং গণিত

সুব্রত চক্রবর্তী

সহসা পথচলতি মানুষেরা একটু আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি সুরু করলো, বেওয়ারিস একটা ষাঁড় হেলতে দুলতে থেমে গেলো গাড়ি-বারান্দার নীচে, ফুটপাতের পুস্তকব্যবসায়ীরা চকিতে তাদের সওদা নিয়ে চলে গেলো কোথায় কে জানে। নতুন শাড়ি পরেছে এমন একটি কিশোরী ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো ট্রামলাইনের গা-ঘেঁষে, খিদিরপুর অঞ্চল থেকে পাখিরা দ্রুত ফিরে এলো জি. পি.ওর আস্তানায়, ভাগ্যবলিয়ে লোকটা নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে উঠে গেলো সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে—বৃষ্টি নামলো কলকাতায়। মেঘের শেষে এই আকস্মিক বৃষ্টি বেজায় উৎপাত সুরু করলো। বেহালায় ফিরবো, টালিগঞ্জ ব্রীজের নীচে এর মধ্যেই

নিশ্চয় এক হাঁটু জল দাঁড়িয়ে গেছে। হাজরা বাসসেণ্টারে ঠায়ে দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তার অন্যদিকে গিয়ে বাস ধরতে হ'বে, তারও কোন উপায় দেখি না, যা বৃষ্টি। এদিকে ক্ষিধেও পেয়েছে খুব, কোন দোকানে যে যাবো উপায় কই তার!

পিঠে পিঠ লাগিয়ে যে লোকটা একমনে সিগরেট ফুঁকছিলো তার দিকে আমার তখনো নজর পড়েনি। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'কি ব্যাপার মহলানবীশ, খুব আত্মস্থ বলে মনে হচ্ছে!'

গলা শুনেই টের পেয়েছি, তবুও তাকিয়ে দেখে নিলাম, বাহুবলীন্দ্র। ওকে এতো ভালো আমার কোন দিন লাগেনি।

ঠাণ্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে যেন। হাজরার বাসসেন্টারের সংক্ষিপ্ততার ফলে ধুতিপাঞ্জাবীও বেশ কিছু ভিজে গেছে ইতিমধ্যে। মাঘের শেষে হঠাৎ বৃষ্টিতে শীতও খুব জাঁকিয়ে বসেছে। অনেকক্ষণ ধরেই কিসের যেন অভাববোধ করছিলাম। বাহুবলীন্দ্র বললে, 'নিন্, সিগরেট খান।' বাহুবলীন্দ্রকে ঈশ্বরের মতো মনে হলো সেই মুহূর্তে।

একটু হেসে বলতে হলো, 'দেখুন তো, হঠাৎ এই অসময়ের বৃষ্টি! ভগবানের এসব ইয়ার্কির কোন মানে হয়।' বলে আমি সিগরেটে মনোযোগ দিলাম।

বাহুবলীন্দ্র বলে, 'আমিও প্রথমে অবাক হয়েছিলাম খুব। এখন দেখছি এতে আশ্চর্যজনক কিছু নেই।'

ওর এই ভূমিকায় আমি যারপরনাই বিব্রত বোধ করলাম। কেননা, আশ্চর্য এই বাহুবলীন্দ্র লোকটি, সবকিছুকেই গণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা স্বভাব ওর। ওর মতে আমাদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, অনুরাগ, ভালোবাসা, বিরহ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয় ঘৃণা, ক্রোধ, বাৎসল্য—সবকিছুই নাকি এক বিরাট সিরিজের কতকগুলি টার্ম, এবং প্রথম দু তিনটের স্বভাবচরিত্র জানলেই অন্যগুলি সম্পর্কেও নিখুঁত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব! ওর এইসব জটিল বিশ্লেষণ

বোঝার ক্ষমতা আমার নেই। কি সব ডিফারেনসিয়েসন, ইনটিগ্রেশন, অ্যালফা, বিটা, গামা, মাথামুণ্ডু বলতে সুরু করে, আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

মনে আছে, একদিন কোন্ রেসটুরেনটে বলেছিলো, 'মহলানবীশ, বলুন তো আটকে আট দিয়ে গুণ করলে কত হয়?' ওর এই প্রশ্নে ভীষণ বিব্রতবোধ করেছিলাম সেদিন। ভয়ে ভয়ে বলেছিলাম, 'কেন, চৌষট্টি।'

উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলো, 'গুড্।' আচ্ছা, একটা আট থেকে এক নিয়ে সেই এক-টাকে অন্য আটের সংগে যোগ করে দিলে আমরা পাচ্ছি সাত আর নয়। তাইতো—

বলি 'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাতকে নয় দিয়ে গুণ করলে তেষট্টি যে।' বলে বাহুবলীন্দ্র হোহো করে হেসে উঠেছিল। আমি তার রসিকতার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে বোকার মতো বসেছিলাম। হাসতে হাসতেই বাহুবলীন্দ্র বলে ছিলো, 'এ হলো অঙ্কের ফিলজফি!'

সুতরাং আজো বৃষ্টি প্রসঙ্গে বাহুবলীন্দ্রর মন্তব্যে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। না জানি কি বিভ্রান্তিকর আংকিক ব্যাখ্যা সে উপস্থিত করে। কিন্তু এ যাত্রা বাঁচিয়ে ছিল একজন কাগজের হকার। হঠাৎ কানের কাছে চিৎকার করে উঠলো, টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, পরলোকে বি. সি. সেনগুপ্ত!'

খবরটা এতোই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যে, বাসসেণ্টারে আশ্রিত আমরা কজন চমকে উঠলাম একই সঙ্গে। যে ছোকরা টেলিগ্রাম বিক্রী করছিলো সে তখনও চেঁচিয়ে চলেছে, 'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, পরলোকে বি. সি. সেনগুপ্ত!'

আমরা তখনও যেন খবরটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আজ বিকেলেই যিনি সুস্থশরীরে ঘানা থেকে ফিরে এসেছেন, যার আগমনবার্তা সান্ধ্যখবরে আমি স্বকর্ণে শুনেছি, তিনি যে এরই মধ্যে

এমন এক ভীষণ খবর হয়ে উঠবেন সেকথা বিশ্বাস করাও কঠিন। হকারকে ঘিরে তখন ছোটখাটো জনতা কত অনায়াসে বৃষ্টিতে ভিজছে, আর সেই ছোকরা অনবরত চিৎকার করছে, 'টেলিগ্রাম, টেলিগ্রাম, পরলোকে বি. সি. সেনগুপ্ত!'

খেয়াল করিনি, বাহুবলীন্দ্র কখন যেন এক কপি টেলিগ্রাম কিনে এনেছে। আমার কাছে এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেছে, 'কাণ্ড দেখেছেন!'

আমি ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম, 'খুন নাকি।'

বাহুবলীন্দ্র আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো, 'আপনার মাথা। নিন, দেখুন।'

দেখলাম। সেই পুরোনো কাহিনী, সচরাচর যা ঘটে থাকে, করোনারি থ্রম্বসিস। সন্ধ্যাবেলা মিটিং সেরে বাড়ী ফেরার পর এ্যাটাক্ এবং আরো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ।

বাহুবলীন্দ্র বললে, 'কি সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন তো।'

আমি কিছু বুঝতে না পেরে বলি, 'এর মধ্যে সাংঘাতিক কাণ্ডর কি আছে?'

'নেই?' এদিকে রাশিয়া আর আমেরিকা দশ বছর ধরে পাঁয়তারা কষছে, শেষকালে ব্রিটিশরা সফল হলো।'

'কি বলছেন পাগলের মতো, আমিও তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'ও, আপনি তাহলে আসল খবরটাই দেখেন নি। নীচে দেখুন।'

দেখলাম; হেডিঙে ছাপা—

AN ENGLISA DOCTOR ROUND ABOUT THE MOON IN FORTY DAYS

"ইংরেজ ডাক্তারের চল্লিশদিনে চাঁদ প্রদক্ষিণ।"

এবং নীচে সংক্ষিপ্ত সমাচারে ডাক্তারের নাম ও পরিচয় এবং সবশেষে মন্তব্য যে, এখনো বিস্তৃত খবর পাওয়া যায়নি।

সত্যি, খবরটা খুবই গোলমেলে। আমরা রাশিয়া ও আমেরিকা-কেই এতদিন ধরে চন্দ্রঅভিযানের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে জানতম। আকস্মিক এই ব্রিটিশ সাফল্যে বিভ্রান্ত হলাম খুব। বাস্তবিকপক্ষে মহাজাগতিকক্ষেত্রে ব্রিটিশদের কোনপ্রকার পরীক্ষানিরীক্ষারও খবর দেখেছি বলে তো মনে হয় না।

বাহুবলীন্দ্র বললে, 'একেই বলে, নেপোয় মারে দৈ!'

আমি শুধোই, 'কি ভাবে সম্ভব হলো বলুন তো।'

সে বললে, 'আরে মশাই, সেটা জানতে পারলে তো হয়েই গেছলো। ভাবতে হ'বে।'

হঠাৎ অনুভব করলাম বাসসেণ্টারের প্রতিবেশীরা কখন যেন চলে গেছেন। তাকিয়ে দেখি, বৃষ্টি থেমে গেছে, বাসগুলো লঞ্চের মতো দ্রুত যাতায়াত করছে খুব।

বলি, 'চলুন, এবার ফেরা যাক।'

বাহুবলীন্দ্র বললে, 'কিন্তু ইংরেজ ডাক্তারের ব্যাপারটা যে ফয়সালা হলো না।'

আমি অত্যন্ত সবিনয়ে বললাম, 'কিন্তু সে সমস্যা সমাধানে আমি তো আপনাকে কোন সাহায্য করতে পারবো বলে মনে করি না। বাড়ি যান, ভাবুন—হয়তো পেয়ে যাবেন সমাধান।'

বলে, আর কালবিলম্ব না করে রাস্তা পেরিয়ে বাস ধরলাম।

... ...

তখনো ভালো করে ভোর হয়নি, আমাদের বাড়ির ঠিকা ঝি আসেনি তখনো, খবরের কাগজও আসেনি—বাহুবলীন্দ্র এলো। বাড়ির সকলে তখনো ঘুমে, পোষা বেড়ালটা পাপোষে মুখগুঁজে ঘুমিয়ে আছে, ঘরটাও রীতিমতো রাত্রির মতো অন্ধকার, তীব্র-ভাবে কলিংবেল বেজে উঠলো।

—'কে ?'

—'মহলানবীশ, আমি বাহুবলীন্দ্র।'

বলা বাহুল্য নয় যে খুবই বিরক্ত হলাম। লোকটার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই! এই সাতসকালে এসে হাজির!

দরজা খুলে বলি, 'কি ব্যাপার, এতো সকালে!'

আমার কণ্ঠস্বরে ও বলার ভঙ্গীতে বিরক্তির আভাস ছিলোই, বাহুবলীন্দ্র সেদিকে মনোযোগ দিলো না। বললে, 'সেই কালকের খবরটা—সমাধান করে ফেলেছি।'

আমি অত্যন্ত নিস্তাপকণ্ঠে বললাম, 'ভেতরে আসুন।'

সে এলো। বসলো আরামকেদারায় পা ছড়িয়ে। সিগারেট ধরিয়ে, ধোঁয়াটোয়া ছেড়ে বললে, 'ঘুমিয়ে ছিলেন নাকি ?'

—'না, চাষ করছিলাম!'

ছেলেমানুষের মতো হোহো করে হেসে ওঠে বাহুবলীন্দ্র, বললে, 'চটেছেন মনে হ'চ্ছে খুব। কি জানেন, সারারাত জেগে সল্যুসনটা পেয়েছি, আপনাকে না দেখিয়ে স্বস্তি পেলাম না।'

—'আমার পরম সৌভাগ্য সেটা। এবার দেখিয়ে ফেলুন।'

আমি কিন্তু মনেমনে খুবই কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলাম সে সময়। কিন্তু প্রাথমিক ব্যবহারের পারম্পর্য রাখার জন্য কৌতূহলের চিহ্ন আমাকে গোপন রাখতে হচ্ছিলো। বাহুবলীন্দ্র কিন্তু সেদিকে নজর দিলো না। বললে, 'একটা কাগজ দিন। সামান্য অংকের ব্যাপার আছে। ভয় নেই, খুবই প্রাথমিক গণিত, যোগবিয়োগ আর গুণ, বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না।'

ওর এই আপ্তবাক্যেও আমি খুব ভরসা পেলাম না। যা হোক, চিঠি লেখার প্যাড্‌টা এগিয়ে দিলাম তার দিকে।

পকেট থেকে একটা পেন্সিল বার করে বাহুবলীন্দ্র বললে, 'খবরটার দিকে নজর দিন এবার। কি আছে খবরটা ?'

'An English Doctor Round About the Moon In Forty Days.'

—'বেশ, ঐ In Forty Days টা বাদ দিলে আমরা পাই, **An English Doctor Round About The Moon.** এটাই মূল খবর। ঐ খবরটার প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর যদি উল্টো দিক থেকে লিখি, তবে আমরা পাই—'

বলে, বাহুবলীন্দ্র কাগজে লিখলো—

M T A R D E A

আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠিক আছে?'

আমি সম্মতিসূচক হাসলাম।

বাহুবলীন্দ্র বললে, 'বেশ, এবার প্রতিটি অক্ষরে নম্বর দিলে আমরা পাই—' বলে সে লিখলো—

M T A R D E A

০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

'এবার আপনি যে কোন তিনটে পরপর সংখ্যা বলুন।'

আমি বোকার মতো চেয়ে থাকি।

'কি হলো? বলুন; যে কোন তিনটে পরপর সংখ্যা।'

আমি বলি, 'এক-দুই-তিন।'

'বেশ; অর্থাৎ একশ তেইশ! একশ তেইশকে উল্টে লিখলে কত হয়?—তিনশ একুশ! ঠিক আছে? বেশ। তিনশ একুশ থেকে একশ তেইশ বিয়োগ দিলে আমরা পাই—একশ আটানব্বই।'

আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না—মৎলব কি বাহুবলীন্দ্রর! এসব যোগবিয়োগের সংগে আসল সমাধানের কোন সম্পর্ক আন্দাজ না করতে পেরে খুবই বিব্রতবোধ করছিলাম সে সময়।

'একশ আটানব্বইকে উল্টে লিখলে,' বাহুবলীন্দ্র বলে চললো, 'আমরা পাই আটশ একানব্বই। কেমন? আটশ একানব্বইয়ের সঙ্গে একশ আটানব্বই যোগ করলে হয় একহাজার ঊননব্বই। এটাই হলো একদিনের সমাধান!'

আমি বিমূঢ়ভাবে বলি 'তার মানে?'

—'কিন্তু In Forty Days—আমাদের এটাও ভাবতে হ'বে। তাই চল্লিশ দিয়ে গুণ করা প্রয়োজন। একহাজার ঊননব্বইকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করলে হয় তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট। এটাই আসল সমাধান।'

আমি রেগে গেলাম বেশ। বলি, 'কি সব যোগ-বিয়োগ করছেন আর কেনই বা করছেন!'

'কেন'র উত্তর আপনি বুঝবেন না। এসব space, time, limit, continuityর ব্যাপার। কিন্তু সমাধান হচ্ছে, তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট।' বলে বাহুবলীন্দ্র উঠলো।

আমি বলি, 'ইয়ার্কি পেয়েছেন নাকি! মানে কি এর!'

বাহুবলীন্দ্র খুব বিজ্ঞজনোচিত হাসলো, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি একটা আস্ত গবেট। তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশ ষাট-এ কি কি সংখ্যা আছে? চার-তিন-পাঁচ-ছয়-শূন্য। তাইতো?'

আমি বলি—'হ্যাঁ।'

'এবার এই কাগজটার নিকে তাকান। কি লেখা আছে এখানে?'

চার হচ্ছে D, তিন R, পাঁচ E, ছয় A, আর শূন্য M,

'তার মানে—DREAM—স্বপ্ন? আচ্ছা, যে কোন তিনটে সংখ্যা নিয়ে করলেই এই পাবো?'

'দেখুনই না করে।' বলে বাহুবলীন্দ্র হঠাৎ চলে গেলো।

পাখী-দৈত্যের কুহক-ঘণ্টা

অদ্রীশ বর্ধন

[পূর্বানুবৃত্তি : পুঞ্জাক্ষি রানজার বো, কুমীরমুখো মায়াথ, চালচিত্তিরের মত চুলওয়ালা গ্রোম আর বালতির মত মাথাওয়ালা লেয়ার—চারগ্রহের এই চার বদমাসকে সুপারম্যান গো-হারান হারিয়ে বন্দী করে রাখলে অন্য এক গ্রহে। সবুজ লণ্ঠন তার ম্যাজিক আংটি দিয়ে সাংঘাতিক ফোর্সফিল্ড তৈরী করে মুড়ে দিলে গোটা গ্রহটাকে। কিন্তু চার শয়তানের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তির জোরে ফাটল ধরল ফোর্সফিল্ডে—আর বিশ্বাসঘাতক রানজার বো পগাড়-পার হল সেই ফাটল দিয়ে—তিনবন্ধু পড়ে রইল পেছনে।]

ফোর্স-ফিল্ডের বাইরে এসে স্থির হয়ে ভাসতে লাগল রানজার-বো। ইউনিফর্মের পকেট থেকে বেরুলো খেলনার মত ক্ষুদে আকারের একটা জাহাজ।

অদ্ভুত জাহাজ। সেকালের বাংলার ময়ূরপঙ্খী নাওয়ের মত দেখতে। দুপাশে তিনটে তিনটে মোট ছটা দাঁড়। দাঁড়ের ডগা

বাটির মত। জাহাজের গতি নির্ভর করে বাটিমধ্যস্থ এনার্জি সেলের ওপরে।

এ জাহাজ কিন্তু জলে চলে না। এক প্রান্তে হাল আছে ঠিকই। কিন্তু সে হাল মহাকাশ পথে দিগ্‌নির্ণয়ের জন্যে।

অসম্ভব মনে হলেও উপায় নেই। কেন না বিক্রমজিৎ ফ্যানটাসি-হিরো। এ গল্পও হল ফ্যানটাসি গল্প। ফ্যানটাসির রাজ্য হল বিজ্ঞানের রূপকথার রাজ্য। সেখানে সব কিছুই সম্ভব। তাই এরপর যা ঘটল, তা অতি বড় কল্পনাতেও আনা যায় না।

হাতের এনার্জি রড খেলনা-জাহাজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল রানজার-বো। মহাশক্তিশালী এনার্জি-রড। মাত্র হাতখানেক লম্বা খোঁটার মত ছোট্ট এই রড ধরেই ফোর্স-ফিল্ড পেরিয়ে মুক্তি পেয়েছে রানজার-বো।

হলদে রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগল এনার্জি-রডের বর্তুলাকার ডগা থেকে। অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন সেই রশ্মি মুহূর্তের মধ্যে খেলনা-জাহাজের অণুপরমাণুর মধ্যে আনল বিশেষ পরিবর্তন। যেন যাদুমন্ত্রবলে সঙ্গে সঙ্গে বড় হতে লাগল জাহাজ।

অবিশ্বাস্য! কিন্তু সত্য! কয়েক মিনিটের মধ্যেই খেলনা-জাহাজ পরিণত হল মস্ত এক জাহাজে। সমস্ত অংগ তার সোনালী ধাতু দিয়ে গড়া। ভেতরটা তামাটে রঙের স্বচ্ছ অথচ সুকঠিন কি এক পদার্থে মোড়া।

এনার্জি-রডের রশ্মি বিচ্ছুরণ বন্ধ করে দিলে রানজার-বো। দাঁড়ে বসে বোর্ডে লাগানো মিটারের কাঁটা দেখে জেনে নিলে মহাজাগতিক শক্তির ধারা বইছে কোনদিকে। কারণ, এ জাহাজ সাধারণ জাহাজ নয়। এ জাহাজ মহাজাগতিক জাহাজ। ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে মহাজাগতিক শক্তির অদৃশ্য স্রোত নিয়ত প্রবহমান—এ জাহাজের এনার্জি-সেল সেই অনন্ত অব্যয় শক্তিকেই নিখরচায় কাজে লাগায়। জ্বালানি দিয়ে মহাকাশপোত চালানো অত্যন্ত

খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু রানজার-বো'র এই আজব কসমিক শিপ চলে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা অফুরন্ত অদৃশ্য জ্বালানির ভাঁড়ারের কণামাত্র খরচ করে।

দাঁড় টানা সুরু হল। চকিতে অকল্পনীয় বেগে বন্দী-গ্রহ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল রানজার-বো। মাথায় তখন তার একমাত্র চিন্তা—যেভাবেই হোক, প্রতিশোধ নিতে হবে। এভাবে যারা তাকে নাস্তানাবুদ করেছে তাদের কারুরই পরিত্রাণ নেই। রানজার-বো নিষ্ঠুর, রানজার-বো নির্মম, রানজার-বো নির্দয়।

কিন্তু প্রতিশোধ নিতে গেলে চাই আরো শক্তি। সবুজ লণ্ঠন, সুপারম্যান আর তাদের চেলাচামুণ্ডাদের লড়াইতে হারাতে গেলে শুধু অধিকতর বুদ্ধির নয়, শক্তিও প্রয়োজন। ওদের সকলের শক্তি একত্র করলেও যে শক্তি রানজার-বো'র গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না—অর্জন করা চাই তেমনি শক্তি।

কোটি কোটি নক্ষত্রখচিত মহাকাশের বুক চিরে উল্কাবেগে উড়ে চলল আশ্চর্য মহাজাগতিক যান। আর প্রায় তেমনি বেগেই চিন্তার স্রোত বয়ে চলল রানজার-বো'র মগজের মধ্যে।

এনার্জি রডের দৌলতে মহাশূন্যের মৃত্যুতুহিন শৈত্যের মধ্যেও উত্তপ্ত রইল রানজার-বো। শুধু শরীরের তাপমাত্রা নয়, দেহকোষের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনেরও যোগান দিয়ে চলল এনার্জি-রড। আলোকের গতির মত প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন হয়েও তাই কোনো কিছুরই অসুবিধা রইল না নাতার।

রানজার-বো ভাবছিল, সুপারম্যান যে গ্রহের বাসিন্দা, সেখানকার মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষের চাইতে অনেক বেশী। সুপারম্যানের মহাশক্তির মূল উৎসই হল পৃথিবীর লঘু মাধ্যাকর্ষণ আর হলদে সূর্যের অফুরন্ত তেজ। সুতরাং সুপারম্যানের চাইতে বেশী শক্তিমান হতে গেলে ঠিক পৃথিবীর মতই একটা গ্রহ খুঁজে বার করা দরকার। সে গ্রহে থাকবে তিনটে

সূর্য। তিন সূর্যের তেজোময় রশ্মি সদাই বর্ষিত হবে সে গ্রহের সর্বত্র।

কম মাধ্যাকর্ষণে অনেক হাল্কা হয়ে গিয়ে তিন সূর্যের বিকিরণ-স্নাত হয়ে চলবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা। তাপরপর একদিন আসবে, যেদিন রানজার-বো হবে সুপারম্যানের চাইতে তিনগুণ শক্তিশালী। এক সূর্য নয়, তিন সূর্যের জ্যোতি আর শক্তি আহরণ করে নেবে সে প্রতিটি দেহকোষে। সেইসঙ্গে ফ্ল্যাস গর্ডনের চাইতে গতিবেগও বেড়ে যাবে তিনগুণ।

অবশ্য এসব এক্সপেরিমেন্টের জন্যে দরকার প্রচুর লোকজন। যন্ত্রপাতি বোঝাই ল্যাবরেটরীও দরকার। কিন্তু সেসবের কোনো অভাব হবে না। রানজার-বো'র বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার জোরে এ সমস্যা মিটতে বেশী সময় লাগবে না।

... ...

কয়েক সপ্তাহ পরের ঘটনা।

পৃথিবী থেকে তিন হাজার পরার্ধ মাইল দূরে রাডাগ্রহে ভূতত্ত্ব সমীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে পৃথিবীর মানুষ বিক্রমজিৎ। অ্যালফা-সেন্টরীর তিন সূর্যর কিরণ সর্বদাই ঝরে পড়ে সে গ্রহের বুকে।

আন্তর্গ্রহ অ্যাডভেঞ্চারে বিক্রমজিতের একমাত্র সঙ্গিনী বধূ রঞ্জনাও রয়েছে সঙ্গে। কতবার দুজনে মিলে কত ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছে রাডাগ্রহকে। ধুলোদানবের প্রতিশোধ, বহু-আতংক হাতিয়ার, উড়ন্ত রশ্মি-বন্দুক ইত্যাদি কাহিনী 'আশ্চর্য!'র পৃষ্ঠায় বেরিয়েছে অনেক আগেই।

এবারে রাডাগ্রহে বিক্রমজিৎ এসেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে। মেরু অঞ্চলের নির্জন প্রান্তরে তাঁবু খাটিয়ে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে তন্ময় হয়েছিল দুজনে, এমন সময়ে কালো আকাশের বুকে বিচিত্র রঙের দ্যুতি নিয়ে ভেসে উঠল দু'দুটো রামধনু সিলিণ্ডার!

রামধনু-সিলিণ্ডার! রামধনু এই কারণে যে তার মধ্যে সপ্ত-

বর্ণের ছটা। সিলিণ্ডার এই কারণে যে পৃথিবীর রামধনুর মত তা ধনুকের আকার নয়, চোঙার মত। বিশাল ব্যাসের এমনি দুটো বাহারি চোঙাই ঝলমল করে উঠল আকাশের পটে।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল রঞ্জনা—"বিক্রম! দেখো, দেখো! রাডাগ্রহের অরোরা বোরিয়ালিস!"

বিমুগ্ধবিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল বিক্রমজিৎ। এবার নিজের জেট চালিয়ে রঞ্জনাকে টেনে নিয়ে উঠে পড়ল আকাশে। তীরবেগে রঙীন চোঙার দিকে যেতে যেতে বললে—"পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে যে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায়, তা কিন্তু পর্দার মত ঝুলতে থাকে শূন্যে। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত তড়িৎ-প্রবাহে ভরা কণিকাগুলো আবহমণ্ডলের ওপরের স্তরে আছড়ে পড়েই এমনি দৃশ্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু এখানে তা মহাকায় চোঙার মত ভাসছে। তাছাড়া যন্ত্রপাতি থেকে যা বুঝেছি, মানুষের স্নায়ুমণ্ডলীতে দারুণ শক দিতে পারে এ চোঙা। কাজেই হুঁশিয়ার।" বলতে বলতে সাঁৎ করে সেই আশ্চর্য রঙীন চোঙার মধ্যে ঢুকে পড়ে স্বামী-স্ত্রী। আশেপাশে ওপরে নীচে বইতে থাকে অজস্র রঙের স্রোত। সে কি বিচিত্র অনুভূতি! যেন লক্ষ মাণিক্য নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠছে চারপাশে। ছেলেমানুষের মত ডিগবাজী খেয়ে ছুটে খেলা জুড়ে দিলে বিক্রমজিৎ আর রঞ্জনা।

... ...

দিনকয়েক পরেই শেষ হয়ে গেল গবেষণা। তাঁবু গুটিয়ে যন্ত্রপাতি মুড়ে নিয়ে জেট-শকটের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আকাশে উঠে পড়ল দুজনে। ফিরে চলল রাডাগ্রহের দিকে। আকাশপথে উড়ে চলেছে যেন দু-দুটো মানুষ-পাখী। পিঠে বাঁধা জেট আগুন আর ধোঁয়া ছড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে দুজনকে। বিক্রমজিতের হাতে বাঁধা দড়ি—দড়ির প্রান্তে জেট-শকটে চাপানো তাঁদের মালপত্র।

ঠিক এমনি সময়ে আচম্বিতে দূর দিগন্তে দেখা গেল কতকগুলো কালো উড়ন্ত বিন্দু।

যেন অনেকগুলো পাখী উড়ে আসছে এদিকে।

রঞ্জনা সেইদিকেই তাকিয়ে ছিল। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল দারুণ বিস্ময়ে—"বিক্রম! বিক্রম! একি দেখছি? দৈত্য-পাখীর ওপর মানুষ চড়েছে, না, আমার চোখের ভুল?"

বিশাল প্রান্তরের কাছাকাছি আসতেই চক্ষুস্থির হয়ে গেল দুজনের।

প্রাগৈতিহাসিক দানব-পাখী টেরোড্যাকটিলের মত কদাকার চেহারা পাখীগুলোর। বকপাখীর মত বিশাল আকার। শকুনির মত ডানা আর তেমনি বক্রচঞ্চু, অস্থিসার ছোট্ট মাথা, করমচার মত রাঙা ক্রুর চোখ।

এহেন মূর্তিমান বিভীষিকার মতই পাখীর ওপর স্বচ্ছন্দে বসে এক-একজন চালক। আদিম বর্বরদের মত বেশবাস। উস্কোখুস্কো চুলে লাল চামড়ার ফিতে বাঁধা। ঘোড়ার লাগামের মত একহাতে ধরা দড়ি। দড়ির অপরপ্রান্তে ফাঁস। সে ফাঁস পাখীর গলায় লাগানো। ঐ দড়ি টেনেই রাক্ষস-পাখীটাকে যেদিকে খুসী চালাচ্ছে সওয়াররা।

সবিস্ময়ে বললে বিক্রমজিৎ—"রঞ্জনা, এরা বুরান বর্বর। কিন্তু অতবড় তারাক পাখীগুলোকে বশ মানালো কি করে? আশ্চর্য!"

রঞ্জনা বললে—"আমিও তাই ভাবছি। অমন হিংস্র পাখী-গুলোকে চালাচ্ছে টুনটুনি পাখীর মতই। তার চাইতেও আশ্চর্য কি জানো বিক্রম?"

"কি?"

"তলার মানুষগুলো। পাখীদের নীচে জমির ওপর সারি সারি হাঁটছে এক দঙ্গল মানুষ। হাঁটছে তো হাঁটছেই। দম দেওয়া কলের পুতুলের মত হাঁটছে। কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। দেখে মনে হচ্ছে সম্মোহিত হয়েছে প্রত্যেকে।"

চমকে উঠল বিক্রমজিৎ। সত্যিই তো, সারি সারি একদল পুরুষ বাধ্য বন্দীর মত প্রান্তরের ওপর দিয়ে হেঁটমাথায় হেঁটে চলেছে। হিপনোটাইজ্‌ড্ নাকি?

"রঞ্জনা, "বললে বিক্রমজিৎ।" বেচারীদের উদ্ধার করতেই হবে। রশ্মি-বন্দুক তৈরী রাখো।"

"ঠিক বলেছো। বুরানদের জেরা করে জানতে হবে, কেন হতভাগা লোকগুলোকে ভেড়ার পালের মত হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে।"

বলেই দুজনে হোলস্টার থেকে টেনে বার করলে মারাত্মক রশ্মি-বন্দুক। তারপরেই পিঠে লাগানো জেটের এক ধাক্কায় উল্কা-বেগে এগিয়ে গেল বিকট পাখী আর ভয়াবহ বুরান বর্বরদের দিকে।

কিন্তু একটুও ঘাবড়াল না বুরানরা। রশ্মি-বন্দুকের সাথে মোকাবিলা করার জন্যে অনুরূপ কোনো হাতিয়ারও বার করলো না।

তার বদলে অদ্ভুত একটা জিনিস বেরিয়ে এল একজনের কোমর-বন্ধনী থেকে।

হাতখানেক লম্বা মোটা সুতোর প্রান্তে ঝোলানো একটা ঘণ্টা। বর্শার মত আকার। বাঁ হাতে ঘণ্টাটা ঝুলিয়ে ডানহাতে ছোট্ট একটা হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারতে উদ্যত হল বুরানবর্বর।

জেট-গতিতে এগিয়ে যেতে যেতে রুদ্ধশ্বাসে সে বললে বিক্রমজিৎ—"রঞ্জনা! রঞ্জনা! হুঁসিয়ার। বন্দুক-টন্দুক না বার করে শুধু ঘণ্টা টেনে বার করার ব্যাপারটা আমার সুবিধের মনে হচ্ছে না। জানি না এঘণ্টা বাজলে ফলটা কি হবে। বেচারা লোকগুলোর ঐ হাল হওয়ার মূলে ঘণ্টার কোন কারচুপি থাকলেও থাকতে পারে।"

মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতেই হাতুড়ির ঘা পড়লো বর্শা-মুখ সোনালী ঘণ্টার ওপর। বিচিত্র ঘণ্টা—বিচিত্রতর তার শব্দলহরী। কানের পর্দাফাটা কোনো শব্দ নয়, বুকের রক্তজমানো কোনো আওয়াজ নয়। অদ্ভুত শ্রুতিমধুর একটা রিনঝিন রিনঝিন বাজনার ঢেউ কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে গেল দিক হতে দিগন্তে। হাওয়ার স্তরে স্তরে সেই সঙ্গীত কাঁপতে কাঁপতে দূরে সরে যেতে লাগল—আবার নতুন নতুন সঙ্গীত ঢেউ এগিয়ে আসতে লাগল ঘণ্টার

মধ্যে থেকে। অশ্রুতপূর্ব সেই যাদু-সঙ্গীত কানের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে গেল বিক্রমজিৎ আর রঞ্জনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মগজ থেকে আদেশবাহী স্নায়ুতন্ত্রী অকস্মাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতেই অসাড় হয়ে গেল ঐচ্ছিক পেশীগুলো।

প্রস্তরপিণ্ডের মত অসহায় হয়ে জেটগতিতে বাতাস ছিন্নভিন্ন করে উড়ে চলল বিক্রমজিৎ আর রঞ্জনা।

ঘণ্টার বাড়ি পড়ার ঠিক আগেই ওপরমুখো হয়েছিল দুজনে—এখন সেইদিকে ঠেলে নিয়ে চলল পিঠে বাঁধা জেট—গতি পরিবর্তনের কোনো উপায় রইল না।

ঐচ্ছিকপেশী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলেও মস্তিষ্ক সচল ছিল। চোখ না ফিরিয়েও তাই বিক্রমজিৎ বুঝতে পারলে রকেট গতিতে দুজনে উঠে যাচ্ছে বটে ওপরে—কিন্তু তাদের মালপত্র বোঝাই জেট-শকট গোঁৎ খেয়ে পড়ছে পাথুরে প্রান্তরের ওপরে।

এদিকে বিরাম নেই কুহক-ঘণ্টার কুহক-সঙ্গীতের।

হাউয়ের মত দু'দুটো মানুষ ছুটে চলল মহাশূন্য লক্ষ্য করে।

হু-হু করে নেমে আসতে লাগল বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। মহা-শূন্যের কনকনে ঠাণ্ডাতেও কিন্তু বিন্দুমাত্র অসুবিধে হল না স্বামী-স্ত্রীর। কারণ, বিক্রম-রঞ্জনার পোশাক তো আর সাধারণ পোশাক নয়। এ পোষাকে অট্রোমেটিক হীট কণ্ট্রোল লাইনিং আছে। অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয় তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। যার ফলে হাড়কাঁপানো বরফের রাজ্যে থাকলে যেমন গা গরম হয়ে যায়, গনগনে মরুভূমিতে থাকলেও তেমনি গা-জুড়িয়ে যায়।

তাই, মহাকাশের অমন মানুষ-মারা ঠাণ্ডাতেও দিব্বি গরম হয়ে রইল বিক্রমজিৎ আর রঞ্জনা। প্যারালিসিস সত্ত্বেও রেডিও মারফৎ কথা কইতে কোনো অসুবিধা ছিল না।

বিক্রমজিৎ ডাকলে—"রঞ্জনা?"

"উঁ।"

"তবুও ভাল, রেডিও বিগড়ে দেয়নি। মরবার আগেও দুটো কথা কইতে পারছি।"

"থাক্ কথার ছিরি ছাখো না।"

"মরতে এখনো অনেক দেরী, রঞ্জনা। কেন না, জেটের ঠেলে তোলার শক্তি আর মাধ্যাকর্ষণের টেনে নামানোর শক্তি সমান সমান হয়ে গেলেই কি হবে জানো?"

"কি?"

"আমরা স্যাটেলাইট হয়ে যাবো।"

"তার মানে?"

"তার মানে জ্যান্ত উপগ্রহ হয়ে রাডাগ্রহের চারদিকে ঘুরপাক দিতে থাকব।"

"সে তো ভালই।"

"সাময়িক ভাল। কেন না, জেটের জ্বালানী ফুরোলেই জেট নিভে যাবে। তখন মাধ্যাকর্ষণ আমাদের টেনে নামিয়ে আছড়ে মারবে জমির ওপর।"

"সর্বনাশ!"

বলতে না বলতেই মাধ্যাকর্ষণের প্রচণ্ড টানে গতিপথ পালটে গেল দুজনের। বাস্তবিকই স্যাটেলাইটের মত বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল রাডাগ্রহের চারদিকে।

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রঞ্জনা—"এবার সত্যিই মরতে হল। জেট বন্ধ হওয়ার আগে অবজারভেটরী থেকে কেউ যদি আমাদের দেখে ফেলে, তাহলেই বাঁচোয়া। নইলে—"

"আছাড়," বললে বিক্রমজিৎ।

[কিন্তু সত্যিই কি বীর বিক্রমজিৎকে প্রিয়তমা পত্নীসহ অসহায়-ভাবে আছড়ে মরতে হবে? পক্ষাঘাত-ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া কি সম্ভব হবে? আগামী সংখ্যায় বেরুচ্ছে সেই শ্বাসরোধী চাঞ্চল্যকর কাহিনী।]

এস, এফ, সিনে ক্লাবের টুকরো খবর

অনেক সদস্যই আমাদের জানিয়েছেন, আমরা কোয়ানটিটি চাই না, কোয়ালিটি চাই। রাশি রাশি ভূষি ফিল্ম চাই না, অল্প কিন্তু উৎকৃষ্ট ফিল্ম চাই। কম হোক, কিন্তু ভাল হোক।

তাঁদের মন নিশ্চয় ভরবে ক্লাবের আগামী কয়েকটি ছবি দেখে। প্রতিটি ছবি নির্বাচন করছেন প্রেসিডেণ্ট শ্রীসত্যজিৎ রায় স্বয়ং। সায়ান্স-ফিকশ্যন ছায়াছবি বলতে ঠিক কি জিনিস বোঝায়, এই ধারণাই যখন অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়, সেক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ছবি-নির্বাচন যে কি দুর্ঘট, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বাল্যাবধি সায়ান্স-ফিকশ্যন অনুরাগী সত্যজিৎবাবুর বিচারে যে ছবি উৎরেছে, সে ছবি প্রতিটি সদস্যের ভাল লেগেছে। যেমন, ভিলেজ অফ দি ড্যামড। এ ছবি অনেকদিন আগে মেট্রোয় একবার হয়ে গেছিল। কিন্তু যাঁরা দেখেননি তাঁদের কথা তো ছেড়েই দিলাম, যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাও দুবার দেখে তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার প্রশংসা করে গেছেন।

— — —

ভিলেজ অফ দি ড্যামড্-এর পরবর্তী ঘটনা নিয়ে এম. জি-এম তুলেছে 'চিলড্রেন অফ দি ড্যামড্'। ছবিটির সচিত্র সংক্ষিপ্ত কাহিনী পরের সংখ্যাতে প্রকাশিত হবে। ...তবে এ ফিল্ম এখন সত্যজিৎবাবুর বিচারাধীন।

— — —

'আশ্চর্য!'র ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত আমেরিকান ছবি "দি ইন্‌ক্রেডিবল শ্রিংকিং ম্যান"ও সবার ভাল লেগেছে। ক্রমাগত ক্ষুদে হয়ে যাওয়া মানুষের এই ছবিটি উঠেছে আমেরিকায়। আর সোভিয়েত দেশ তুলেছে "দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান।" এ-ও এক আজব মানুষের গল্প। তবে তার গতিবিধি জলে মাছের মত এবং ডাঙায় মানুষের মত। এক কথায় সে উভচর। দুই মানুষের দুটি ছবির মধ্যে আন্তর্জাতিক দরবারে খ্যাতিলাভ করেছে সোভিয়েত ছবিটি। ১৯৬৩ সালে ত্রিয়েস্তেতে অনুষ্ঠিত বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সায়ান্স-ফিকশ্যন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্কার পায় একটি চেকোশ্লোভাকিয়ান ছবি— 'ইকারাস এক্স-বি-ওয়ান।' দ্বিতীয় হবার গৌরব অর্জন করে 'দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান।" ছবিটি রঙীন।

চেক ছবিটিও আনার চেষ্টা চলছে।

— — —

ইতিমধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ান কনস্যুলেট-জেনারেলের সৌজন্যে তিনখানি সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি পাওয়া যায়। সত্যজিৎবাবুই টেলিফোন করেছিলেন, ফলে অদ্রীশ বর্ধনের হাতে তিনখানি ফিল্ম তুলে দিলেন দূতাবাসের কর্মাধ্যক্ষ।

ছবি তিনটির নাম ডেভিল্‌স্ ট্র্যাপ, ক্রিয়েশন অফ দি ওয়ার্ল্ড এবং ম্যান ফ্রম দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী।

কলকাতার এক খ্যাতনামা ক্যামেরা সরঞ্জামের প্রতিষ্ঠান, সত্যজিৎবাবু একবার টেলিফোন করতেই সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন তাঁরা। যখন খুসী সত্যজিৎবাবু এলেই প্রজেকশন রুম খুলে দেওয়া হবে।

দুপুর দুটোর সময়ে ল্যাবরেটরী থেকেফিরেই অদ্রীশ বর্ধনকে ফোন করলেন সত্যজিৎবাবু—"অদ্রীশ, বিকেল ৫টায় প্রজেকশনের ব্যবস্থা হয়েছে। তুমি সাড়ে চারটায় আমার বাড়ী চলে এসো ফিল্ম নিয়ে। চা-টা খেয়ে নিয়ে একসঙ্গে বেরেনো যাবে।"

সেদিন আবার খাদ্য আন্দোলনের জন্যে কলকাতায় ট্রাম-বাস পুড়ছে। রাস্তায় শুধু মিছিল, ফেস্টুন, কাতারে-কাতারে ক্ষিপ্ত জনতা আর দণ্ডপাণি পুলিশ।

কিন্তু সেজন্য বাড়ীতে বসে রইলেন না সত্যজিৎবাবু। চৌরঙ্গী বন্ধ, মিছিল আসছে? ঠিক আছে, ড্রাইভার, গাড়ী ঘুমাকে লেও। বিশপ লেফ্রয় রোডসে চলো। এমনি করে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরে যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছলেন তিনি। সঙ্গে একমাত্র ছেলে বাবু এবং অদ্রীশ বর্ধন।

এবার সদস্যদের ভাল ছবি দেখানোর জন্যে ক্লাব প্রেসিডেন্ট যে কতখানি ভাবেন, তার একটা নমুনা দেওয়া যাক।

চেক ছবি 'ডেভিল্‌স্ ট্র্যাপ' জুল ভর্ণের গল্প অবলম্বনে তোলা। পরিচালনা করেছেন খ্যাতনামা ডিরেক্টর ক্যারেল জেমান—যাঁর দুখানি ফ্যানটাসি ছবি নিয়ে এই সেদিনও কাগজে-কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বেরিয়েছে। কিন্তু তবুও সত্যজিৎবাবু এ ছবি নাকচ করলেন শুধু একটি কারণে—এমনকি রীলগুলো সঙ্গেও নিলেন না। কারণটা কি জানেন?

ছবিটির সাব-টাইটেল নেই। দুর্বোধ্য চেক-ভাষা কেউ বুঝবেন না—ছবিও ভাল লাগবে না। তাই অন্যান্য ফিল্ম সোসাইটি সাব-টাইটেলবিহীন ছবি দেখালেও উনি রাজী নন।

কাজেই ডেভিল্‌স্ ট্র্যাপ বাদ গেল।

সায়ান্স ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের সদস্যদের জন্য ছবি বাছাই করার উদ্দেশ্যে প্রজেকশন রুমে পর্দায় পড়ল রঙীন কার্টুন সায়ান্স-ফিকশ্যন 'ক্রিয়েশন অফ দি ওয়ার্ল্ড'। তিন মিনিট দেখতে না

দেখতেই সে ছবিও বাতিল হয়ে গেল। কারণ সেই একই। সাব-টাইটেল নেই।

এবার প্রজেক্টরে লাগানো হল "ম্যান ফ্রম দি ফার্স্ট সেঞ্চুরী।" মিনিট পাঁচেক পরে অদ্রীশবাবুকে বললেন—"এই হল খাঁটি সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি।" পুরো চল্লিশ মিনিট তন্ময় হয়ে দেখলেন।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—"ঠিক আছে। এতেই হবে।"

ছবিটি নির্বাচিত হল। এস. এফ. সিনে ক্লাবের বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে ভাল ছায়াছবি সংগ্রহ করে, বাছাই করে, যাচাই করে দেখার পদ্ধতির এই হলো দৃষ্টান্ত।

— — —

'ফার্স্ট মেন ইন দি মুন' কলকাতায় আসছে। রঙীন ছবি। ওয়েলসের কাহিনী। ডিষ্ট্রিবিউটর চ্যারিটি শো-য়ের অফার দিয়েছে সত্যজিৎবাবুকে। কিন্তু ছবিটি এখনও তাঁর বিচারাধীন।

— — —

কোন্ ছবি কোন্ দেশে কি প্রশংসা পেয়েছে, কোন্ ম্যাগাজিনে কি রকম তারিফ করেছে, সবই সত্যজিৎবাবুর নখদর্পণে। সত্যিই ফিল্মদুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্য এবং স্মৃতিশক্তি দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। চেক-ছবি "ক্রিয়েশন অফ দি ওয়ার্ল্ড"য়ের কতটুকুই বা আর দেখলেন। কিন্তু তিন মিনিট পরেই বললেন—"ছবিটা পুরোনো মনে হচ্ছে—টেকনিকগুলো পুরোনো।"

— — —

সদস্যদের যে পোস্টকার্ডে মার্চ ও এপ্রিলের দুটি শো-য়ের

সংবাদ দেওয়া হয়েছে, তার লে-আউট করে দিয়েছেন সত্যজিৎবাবু স্বয়ং।

— — —

সত্যজিৎবাবু কি সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি তুলবেন?

এস. এফ. সিনে ক্লাব উদ্বোধনের পর থেকেই এ প্রসঙ্গে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি যে উনি তুলবেন, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু তার আগেই আমন্ত্রণ এসে গেছে 'ফ্যানটাসায়ান্স' ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে—সত্যজিৎ রায়ের সায়ান্স-ফিকশ্যন ছবি চাই।

বিস্তারিত খবর পেছনের কভারে ছাপা হল।

এ খবর এখনো কেউ জানেন না।

— — —

এবারে একটি মজার খবর দিয়ে শেষ করি।

ক্লাব দপ্তরে সেদিন একটা রেজিস্টার্ড খাম এল। খাম ছেঁড়ার পর দেখা গেল, ভেতরে কিছু নেই!

কিছুদিন পরেই প্রেরক স্বয়ং এলেন। শূন্য লেফাপার কাহিনী শুনে অমায়িক হেসে বললেন, "খামটা রেজিস্টার্ড করে দিয়েছিলুম। ফর্মটা আমার পকেটেই ছিল। এই নিন।"

ভুলো-মন অথচ সায়ান্স-ফিকশ্যন পাগল এই মানুষটি এখন আমাদের সদস্য।

ত্রিয়েস্তে ফিল্ম-ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত

দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান

সংক্ষিপ্ত কাহিনী

.....

রঙীন লেনফিল্‌ম্ প্রোডাকসন্‌স্, দৈর্ঘ্য ২৬৮৩ মিটার

চিত্রনাট্য : আলেকজাণ্ডার জেনোফনটভ, আলেক্সি ক্যাপলার, অ্যাকিবা গোলবার্ট।

পরিচালনা : গেন্নাডি ক্যাজান্‌স্‌কি, ভ্ল্যাডিমির চেবোটারেভ

ক্যামেরা : এডুয়ার্ড রেজভস্কি

ভূমিকালিপি : ইকতিয়ানডার—ভ্ল্যাডিমির কোরেনেভ। গুতিয়েরি—অ্যানাসতাশিয়া ভার্টিনসকায়া। পেড্রো—মিখাইল কোজাকভ। গুতিয়েরির বাবা—অ্যানাটোলি স্মরানিন। স্যালভেটর—নিকোলাই সিমোনভ। ওলসেন—ভ্ল্যাডিমির ডেভিডেভ।

গল্প : শান্ত সমুদ্র। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউয়ের ওপর দুলছে ভারী সুন্দর একটা স্কুনার। মাস্তুলওলা ক্ষুদে জাহাজ। নাম তার জেলী ফিশ।

পেঁজা তুলোর মত ধবধবে শাদা মেঘ আকাশে দাঁড়িয়ে। হাওয়া নেই। চারিদিক নিথর নিস্তব্ধ। আচম্বিতে খান খান হয়ে ভেঙে গেল নৈঃশব্দ।

স্কুনারের ডেক থেকে ভেসে এল কড়া গলার হুমকি। তারপরেই বিদ্যুৎবেগে ডেক থেকে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল একটি মেয়ে।

মেয়েটি রূপসী। নাম, গুতিয়েরি। স্কুনারের মালিক পেড্রো জুরিটার লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার এই একটিমাত্র পথই খোলা ছিল তার সামনে। পেড্রো তাকে ভালবাসে। উন্মাদের মত ভালবাসে। গুতিয়েরির সুঠাম দেহবল্লরী দৃষ্টিপথে এলেই অমনি উপোসী মানুষের মতই অপরিসীম ক্ষুধায় দপ করে জ্বলে ওঠে তার ক্রুর কালো চোখ।

সমুদ্রের তরঙ্গ শান্ত বটে, উষ্ণ বটে, কিন্তু নিরাপদ তো নয়। সাগরের জলে কত বিপদ যে ওৎ পেতে বসে রয়েছে, তার হিসেব কে রাখে? কিন্তু সে হিসেব নেওয়ার সময় গুতিয়েরি পায়নি। জুরিটার লোলুপ কামনামদির দৃষ্টির সামনে থাকার চাইতে সাগরের সহস্র বিপদও শ্রেয়।

সহসা সুন্দরী গুতিয়েরিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এল বিরাটকায় একটা হাঙর। আর মাত্র সেকেণ্ড কয়েক—তারপরেই সব শেষ।

কিন্তু আচমকা বিদ্যুৎরেখার মতই একটা অদ্ভুত আকৃতি ঝলসে উঠল জলের মধ্যে। ঝকঝকে ছুরী খেলে গেল জলতলে……চারপাশের ঢেউ রাঙা হয়ে গেল হাঙরের রক্তে। বেঁচে গেল গুতিয়েরি……

এ গল্প একজন উভচর মানুষের। ডাঙায় আর জলে তার অবাধ গতি। নাম তার ইকতিয়ানডার। নির্ভীক অথচ কোমল-হৃদয় এই তরুণেরই নিষ্পাপ প্রেম আর অসীম যাতনার কাহিনী—"দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান।"

খেয়ালী বৈজ্ঞানিক স্যালভেটরের মুহূর্তের খেয়ালে ইকতিয়ানডারের সৃষ্টি। সমুদ্রই তার ঘরবাড়ী—মধ্যে মধ্যে শুকনো ডাঙায় আবির্ভাব ঘটে তার। সৃষ্টিকর্তা স্যালভেটরের ইচ্ছায় জলে তাঁকে থাকতেই হবে—জলই তার জীবন। সাগরের একছত্র অধিপতি সে। সমুদ্র-জগতের খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে। এই সমুদ্রেই গুতিয়েরির সংস্পর্শে এল সে। ভালবাসল। নিখাদ প্রেমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠল। গুতিয়েরির সন্ধানে জল ছেড়ে ডাঙাতেও অভিযান চালাল।

জলতলের অপরূপ দৃশ্যর পর দৃশ্য অবিশ্বাস্য দক্ষতায় সেলুলয়েডের বুকে ধরে রাখার জন্যে ক্যামেরাম্যান সত্যিই প্রশংসার্হ।

বিখ্যাত সোভিয়েত সায়ান্স্-ফিকশ্যন লেখক ভ্ল্যাডিমির বিলায়েভের "দি অ্যামফিবিয়ান" অবলম্বনে আলোচ্য ফিল্মটি নির্মিত হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য মিল নেই, কিন্তু মূল কাহিনীকে অনুসরণ না করেও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসিত হবার মত উৎকৃষ্ট ছবি তৈরী যে সম্ভব—"দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান"ই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। সুবৃহৎ মূল কাহিনীটি 'আশ্চর্য!'তে অনূদিত হবে আগামী সংখ্যা থেকে।

১৯৬৩ সালে বিশ্বের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সায়ান্স্-ফিকশ্যন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ত্রিয়েস্তেতে। উৎসবে যে ছবিটি দ্বিতীয় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করে—তা এই "দি অ্যামফিবিয়ান ম্যান।"

'আশ্চর্য!' পত্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ভারতের একমাত্র সায়ান্স্-ফিকশ্যন সিনে ক্লাবের সহস্রাধিক সদস্যের সামনে ১০ই এপ্রিল সকালে কলকাতার ম্যাজেসটিক সিনেমা হলে ফিল্মটি বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে দেখানোর আয়োজন হয়েছে।

কালের সেরা কালি

হিজি ফ্লো

ফাউন্টেন পেনের কালি

সলভেন্ট ফ্রী-১০০০ যুক্ত

গ্রাম:-"হিজিনকো"
ফোন:-২৪-৪৯৭৩

হিন্দুস্থান জেনারেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কোং
৭৬, গনেশ চন্দ্র এভেনিউ • কলিকাতা-১৩

জটিল জীবনে সুখ-শান্তি-আনন্দের পথ দেখাবে

সুখী মন

মাসিকপত্র

Regd. No. C-118 ★ Aschorjo ! ★ March-April 1966 ★ 75 Paise

যে খবর এখনো কেউ জানেন না···

'ফ্যানটাসায়ান্সে' এস. এফ. সিনে ক্লাবের সভাপতি

সত্যজিৎ রায় আমন্ত্রিত

কেবলমাত্র সায়ান্স ফিকশ্যন ফিলমের যে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ইটালীতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, সেই 'ফ্যানটাসায়ান্স' উৎসবে যোগ-দানের জন্য ভারতে একমাত্র এস,এফ, সিনে ক্লাবের সভাপতি সত্যজিৎ রায়ের কাছে সায়ান্স ফিকশ্যন চলচ্চিত্র পাঠানোর আহ্বান এসেছে।

কলকাতায় বিশ্বের প্রথম সায়ান্স ফিকশ্যন সিনে ক্লাব 'আশ্চর্য!' পত্রিকার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই সম্মানজনক আহ্বানে ভারতের যে মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে